ভূমিকা।

ভক্তিভাজন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বক্তৃতাগুলি শুনিবার সময়ে পেন্‌সিল দ্বারা কয়েকটী চিহ্ন রাখিতাম।—পরে স্মৃতি ও ভাবযোগে তাহার তাৎপর্য্য লিখিয়া জনহিতার্থে "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় প্রকাশ করিতাম; সে সকল verbatim অর্থাৎ যথাযথশ্রুত-লিপি নহে।

"আচার্য্যের উপদেশ," "ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ," "সেবকের নিবেদন," "সাধুসমাগম," "ব্রহ্ম-গীতোপনিষৎ," "মাঘোৎসব" ইত্যাদি নামে আমার সকল প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রতিমা নামক পুস্তক আমার নিজের স্মৃতি হইতে এবং পূর্ব্বোক্ত কোন কোন গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া প্রতিমা নামক এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহার কোনও প্রবন্ধ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হয় নাই।

ইহা পাঠ করিয়া সকলে বুঝিতে পারিবেন, আচার্য্য কেশবচন্দ্র কেমন সুন্দররূপে দুর্গা, কালী প্রভৃতি প্রতিমার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।

৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,	প্রত্যাদেশ লেখক
কলিকাতা,	এবং প্রকাশক
১৯১২ খৃষ্টাব্দ।	শ্রীপ্যারী মোহন চৌধুরী।

প্রতিমা।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা।

কালী।

জগজ্জননী জগৎ সৃজন ও পালন করিতেছেন। সরস্বতীরূপে তিনি সন্তানদিগকে জ্ঞান বিতরণ করেন এবং লক্ষ্মীরূপে ঘরে ঘরে তিনি ধন ধান্য বিতরণ করেন। আবার অখণ্ড নির্লিপ্ত উদাসীনভাবে আপনার মহিমাতে আপনি ব্যাপ্ত করিতেছেন। তবে অবতার শব্দ কেন ধর্ম্মের অভিধানে স্থান পাইল? ঈশ্বরকে লক্ষ্মী সরস্বতী ও উদাসীনরূপে পূজা করিয়া কেন মনুষ্য ক্ষান্ত হইল না? লোকে কেন অবতার মানিল? জনসমাজে ঈশ্বরাবতরণকল্পনার নিগূঢ় কারণ কি? যখনই পৃথিবীর কোন সঙ্কট উপস্থিত হয় তখনই ঈশ্বরের অবতরণ আবশ্যক, এ যুক্তি মানুষকে কে শিখাইল? অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কি ঈশ্বর পৃথিবীতে ছিলেন না? ঈশ্বর পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুতে, সমুদয়

সৃষ্টিমধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন। কিন্তু বাহিরে ঈশ্বরের বিচিত্র প্রকাশ দেখিয়া মনুষ্যের চিত্ত সন্তুষ্ট হইল না। মনুষ্যের মন ঈশ্বরকে আপনার মধ্যে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল। মনুষ্য আপনার হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের অবতরণ প্রার্থনা করিল। স্বর্গের ঈশ্বর কেবল স্বর্গের ঈশ্বর নহেন, তিনি পৃথিবীরও ঈশ্বর। তিনি কেবল চন্দ্র সূর্য্যের ঈশ্বর নহেন, তিনি পৃথিবীর নদনদীর এবং বৃক্ষ লতাদিরও ঈশ্বর। স্বর্গের ব্রহ্মকে মনুষ্য পার্থিব সমস্ত বস্তুতে অবতীর্ণ দেখিল, কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া তাহাকে মনুষ্যের আকার-মধ্যে দেখিতে ইচ্ছা করিল। অবতীর্ণ হইবার যথার্থ অর্থ মনুষ্যসমাজে মানবদেহে অবতীর্ণ হওয়া। ঈশ্বর চন্দ্র সূর্য্য অথবা বৃক্ষেতে রহিলেন তাহাতে পাপীর কি? পুষ্পের লাবণ্যে, উষার সৌন্দর্য্যে হরি বর্ত্তমান, এ সংবাদ অধর্ম্মে উত্তপ্ত যে মন তাহার পক্ষে কি আদরণীয় হইতে পারে? যতক্ষণ না ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয়ে অবতীর্ণ হন, ততক্ষণ তাহার পক্ষে ঈশ্বর থাকা না থাকা প্রায় সমান। আমার আপনার অন্তরে যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে এক দূরস্থ অপরিচিত অনিশ্চিত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করাতে

কি লাভ? পর্ব্বতে সমুদ্রে পাথরে মাটীতে সকল স্থানে হরি আছেন, কেবল মনুষ্যের ভিতরে কি হরি নাই? ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট এই সুবিশাল বিশ্বমধ্যে রহিলেন, তাহাতে আমার প্রাণের তৃপ্তি হয় না। আমার মন মনুষ্যপ্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিতে চায়। আমার মন জিজ্ঞাসা করে মনুষ্যের মধ্যে কি ঈশ্বর নাই? যখন আমি আমার হস্ত দিয়া বক্ষের মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করি, যখন আমি দেখি মনুষ্য-প্রকৃতির ভিতরে ব্রহ্ম আসিয়া বাস করিতেছেন, তখন আমার সকল সন্তাপ দূর হয়, এবং হৃদয় পবিত্র ও সুখী হয়। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর সকল স্থানকে আপনার বাসস্থানরূপে মনোনীত করিলেন, কেবল মনুষ্যকে কি তিনি হেয় জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিলেন? বৃক্ষ লতা ও ক্ষুদ্রতম তৃণমধ্যেও স্বীয় মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, কেবল মনুষ্যকে কি তিনি বলিলেন—অস্পৃশ্য মানব দূর হও? যদি মনুষ্যসমাজে হরি না থাকেন, যদি ইতিহাসের ঘটনা মধ্যে তিনি না থাকেন, তবে হরিলীলাভাগবত অসম্ভব। কে বলে মনুষ্যের দেহমন্দিরে ঈশ্বর নাই? যখনই বিশ্বাসনয়ন খুলিয়া জনসমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে তখনই দেখিতে

পাইবে, হরি নরনারীর দেহ মনের মধ্যে শক্তিরূপে বাস করিতেছেন। সেই হরির শক্তি মনুষ্যের রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এক মহ শক্তি, এক প্রকাণ্ড তেজ মনুষ্যের দেহ মন ও আত্মার ভিতরে কার্য্য করিতেছে। এই শক্তি কে জান? সেই আদ্যাশক্তি ভগবতী। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন তিনি এখন কোথায়? তিনি কি সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন? না, যে শক্তি এই সমুদয় সৃজন করিল তাহা এখনও জীবিত রহিয়াছে। আমাদের যতগুলি শক্তি আছে, সকল শক্তির মূলে তিনি। বন উপবনে, গিরি পর্ব্বতে, বিশ্বমন্দিরে আমরা হরিপূজা করিলাম, কিন্তু চিরকাল পরের বাড়ীতে ব্রহ্মপূজা করিয়া হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। মনুষ্যের মন এই বলিয়া আক্ষেপ করে;—"হায়! চিরদিন পরের বাড়ীতে ঈশ্বরের পূজা করিতে হইল, কবে নিজের হৃদয়ে, নিজের বাড়ীতে তাঁহার পূজা করিব"? সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্ম, সর্ব্বশক্তিমতী বিশ্বজননী আমাদের প্রতিজনের দেহ মনের মধ্যে শক্তিরূপে অধিবাস করিতেছেন। ঈশ্বর আপনি আমাদের প্রতিজনের মনের মধ্যে তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ

করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তবে কেন আমরা তথায় তাঁহাকে উপলব্ধি করিব না? যে শক্তি আকাশের চন্দ্র সূর্য্যকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সেই শক্তিই আমাদের বাহুতে বাহুবল, চক্ষে দৃষ্টিশক্তি, কর্ণে শ্রবণশক্তি। তুমি অবিশ্বাসী হইয়া মনে কর এ সমুদয় তোমার শক্তি, তুমি মনে কর তোমার বলে তুমি ধন ধান্য উপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা নিজবলে নিজ-চেষ্টায় আপনার পুষ্টিসাধন কর। এরূপ নাস্তিক কল্পনা পরিহার কর। তুমি কি এক মিনিট আপনাকে রক্ষা করিতে পার? তোমার নিজের একটীও মূল শক্তি নাই। যে সৃজনীশক্তি তোমাকে সৃজন করিল, তাহাই তোমার জীবনসংরক্ষিণী শক্তি। সেই আদ্যাশক্তি, সেই অনন্তকালের মহাশক্তি ভিন্ন তুমি এক মুহূর্ত্তকাল বাঁচিতে পার না। যে শক্তিতে তুমি বাঁচিয়া আছ, তুমি চলিতেছ, বলিতেছ, চিন্তা করিতেছ, ধর্ম্মসাধন করিতেছ, সে শক্তি সামান্য শক্তি নহে। ইহার ভিতরে স্বর্গীয় শক্তি আছে। ইহা অদ্যকার শক্তি নহে, অনন্ত-কালের শক্তি, অনন্তকালের ঘনীভূত শক্তি। এই ঘনীভূত শক্তি কালরূপে কেন বর্ণিত হইল? শক্তি-মূর্ত্তি কেন কালীমূর্ত্তি হইল? হে মানব, তুমি যদি

তোমার ভিতর দিয়া গভীর অনন্ত দেবশক্তি দর্শন কর তাহা হইলে দেখিবে প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রকৃতিশক্তি আদ্যাশক্তি। অনন্তশক্তি গভীর জলরাশির ন্যায় ঘোর কালবর্ণ। অল্প জল কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। যতই জল অধিক হয় ততই ঘোলা হয়, খুব গভীর হইলে ক্রমে সবুজ, নীল, ঘোর নীল, শেষে প্রায় কাল হইয়া যায়। যে জল স্বচ্ছ ছিল, সেই জলই শেষে গভীরতা বশতঃ কৃষ্ণবর্ণ হইল। তদ্রূপ ক্ষুদ্র জীবশক্তি স্বতন্ত্র অনুভব করিলে উহাতে কোন রং কল্পনা হয় না, কিন্তু যদি উহার নিম্নে গভীররূপে দেখি. তাহা হইলে দেখিব শক্তির পর শক্তি, ঘোরতর ঘনতর শক্তি, দৈবশক্তি, ব্রহ্মশক্তি; শেষে একেবারে অতলস্পর্শ অনন্ত শক্তিসমুদ্রের ভয়ানক কালবর্ণ আমাদিগকে বিস্ময়াপন্ন ও কম্পিত করে। দেখ কেমন ব্রহ্মের কালীমূর্ত্তি নিষ্পন্ন হইল। যে সৃজনী-শক্তি হইতে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল, সেই শক্তি আমাদিগের জননী, তিনিই জীবপ্রসবিনী জগন্মাতা। তিনি স্বয়ং সৃষ্ট সন্তানদিগের অন্তরে মূলাধার ও মূলশক্তিরূপে নিয়ত অধিবাস করিতে-ছেন। এই মনুষ্যদেহে হরি সর্ব্বদা বর্ত্তমান।

প্রত্যেক মানুষের হৃদয় মনের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি নিহিত ও অন্তর্ভূত। কেমন, হে ভাবুক ব্রাহ্ম এখন তোমার নিজের গৃহে ব্রহ্মদর্শনের ঐ স্পৃহা চরিতার্থ হইলতো ? তোমার ঈশ্বর ঐ দূরস্থ চন্দ্র সূর্য্যে ছিলেন, এখন তোমার নিজের দেহ মনের মধ্যে তাঁহার অবতরণ ও অন্তর্নিবেশ হইল। তিনি শক্তিরূপে তোমাব শারীরিক ও মানসিক তাবৎ শক্তিমধ্যে বাস করিতেছেন। অতএব ব্রহ্মকে আর দূর ভাবিও না। অপরের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়া কে কোথায় সুখী হইয়াছে ? ছাড় পরকে, ভাব আপনাকে। তোমার অত্যন্ত নিকটস্থ আত্মীয়, আপনার সহোদরের ভিতরেও ঈশ্বরকে দেখিতে বলিতেছি না, একেবারে তোমার দেহ-মনের মধ্যে সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে দেখিতে বলিতেছি। তোমার নিজেব জীবনের মধ্যে তোমার হরিকে দেখাইয়া দিতেছি। যেমন তুমি তোমার বক্ষের দ্বার খুলিবে তৎক্ষণাৎ অনন্ত কালীমূর্ত্তি অন্তরে প্রকাশিত হইবে। সেই কালীমূর্ত্তি মৃত্তিকানির্ম্মিত অথবা কোন ধাতুনির্ম্মিত কালী নহে ; কিন্তু নিরাকারা চিণ্ময়ী শক্তিরূপিণী কালী। সেই শক্তিরূপিণী কালী কি পদার্থ ? কেবলমাত্র শক্তি। কি শক্তি ? সৃষ্ট পরি-

মিত জড় শক্তি নহে, কিন্তু আদ্যাশক্তি, প্রথমাশক্তি, চিৎশক্তি। তাঁহার মন্দির কোথায়? কোথায় গেলে তাঁহাকে দেখা যায়? তাঁহার কোন স্বতন্ত্র মন্দির নাই। জীবদেহই প্রকৃত কালীমন্দির, সমস্ত বিশ্ব-রাজ্যই কালীঘাট। যেখানে যত শক্তি আছে সেই শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত যে মূলশক্তি তিনিই আকার-প্রকার-নাম-বিহীন কালী। শাস্ত্রে যিনি ব্রহ্মরূপে উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে আপনার প্রাণ মন্দিরে দেখ; আপনার প্রত্যেক শক্তিতে কালীমূর্ত্তি ধ্যান কর। তোমার চক্ষে তোমার বক্ষে, তোমার শোণিতে, তোমার নিঃশ্বাসে, কালীরূপ দর্শন কর, তোমার দৃষ্টি-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি, স্মরণ-শক্তি, ধী-শক্তিতে, তোমার ভুজবলে, তোমার বুদ্ধিবলে, কালীশক্তি উপলব্ধি কর। সেই সর্ব্বারাধ্যা কালীশক্তি তোমার হৃদয় মন আত্মা সমস্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! স্বয়ং ঈশ্বর তোমার শরীর মনের মধ্যে শক্তিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। যদি শক্তিমূর্ত্তি কালীমূর্ত্তির পূজা করিবে, প্রজ্ঞাবলে হৃদয় কবাট উন্মুক্ত কর, এবং আপনার জীবনীশক্তির মধ্যে তাঁহাকে দর্শন কর। সেই শক্তির অন্তর্ধানে

তোমার শরীরের নিপাত! মহাশক্তির তিরোভাবে জীবের নিশ্চিত প্রলয়। সেই শক্তি ভিন্ন কিছুই জন্মে না, কিছুই স্থিতি করিতে পারে না। ঐ যে প্রকাণ্ড সমুদ্রের ন্যায় মহাকালী নিত্যকাল বাস করিতেছেন, ঐ সমুদ্রের বিন্দুমাত্র আমাদের সমস্ত শক্তির আধার। আমার দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি সমস্ত শক্তি ঐ কণামাত্র শক্তিকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মতেজ মনুষ্যের শরীর মনকে সতেজ করিতেছে। অনন্ত ঘোরতরা কালীশক্তি নিয়ত বিবিধ শক্তি বিধান করিতেছে। সেই মহাশক্তি মহাকালীর হস্তে অহঙ্কারী মানুষের মুণ্ড ঘুরিতেছে। সেই ভয়ঙ্করা মহাদেবীর কাছে ভ্রূকুটী করিও না। হে মানব, শক্তির কাছে তোমার তেজ খাটিবে না, সেই দর্পহারিণীর নিকটে তোমার সমুদয় অহঙ্কার চূর্ণ হইবে, কেননা তোমার সমস্ত শক্তি তাঁহার আশ্রিত বলিয়া তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার পদানত হইবে। যে মা আমাদিগকে জন্ম দিলেন, যে জননী আমাদিগকে পৃথিবীতে আনিলেন, তাঁহার মুখের পানে আমরা তাকাইতে পারি না। তাঁহার শক্তির প্রভাবে আমরা কম্পিত কলেবর হই। কি ভয়ানক শক্তি!

সমুদ্র পর্ব্বত বায়ু বৃষ্টি অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য সকলে যাঁহার কাছে জোড় হাত করিয়া স্তব করিতেছে, যাঁহার ইঙ্গিতে সৃষ্টি, ইঙ্গিতে প্রলয়, তাঁহার মুখের দিকে কে তাকাইতে পারে ? আমি কোন্ শক্তির কথা বলিতেছি জান ? যে ভয়ঙ্করা সৃজনীশক্তি ঘোর অন্ধকারের ভিতর হইতে ব্রহ্মাণ্ডের কেশ ধরিয়া তাহাকে টানিযা বাহির করিল। যখন কিছুই ছিল না তখন সেই শক্তি গম্ভীরস্বরে বলিল,—"আয় সূর্য্য আয়, আয় চন্দ্র আয়, পৃথিবী গ্রহ তারা নক্ষত্র সকলে সারি গাঁথিয়া আয়।" অদ্যাপি সেই শক্তি আকাশমার্গে কোটী কোটী পৃথিবীকে অঙ্গুলীতে ঘুরাইতেছে। সেই মহাশক্তি মহাকালীর বিচিত্র ক্রীড়া মহাসমুদ্রের আস্ফালনে ও ভীষণ বজ্রধ্বনিতে উপলব্ধি করিয়া আমরা ভীত হই। যখন এই শক্তি ভৌতিক রাজ্য হইতে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মশক্তিরূপে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তখন ইহাব মূর্ত্তি আরও ভয়ঙ্কর হয়। ইহা সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে মহাবিক্রম প্রকাশ করিয়া অসুর বধ করে। বিশ্বসৃজনী মহাশক্তিই ভয়ঙ্করা অসুরসংহারিণী শক্তি। সেই একই শক্তি বিচিত্রা ও বহুধা হইয়া জড়জগতে ও

ধর্ম্মজগতে কার্য্য করিতেছে। জ্ঞানশক্তি, প্রেমশক্তি, পুণ্যশক্তি সকলই সেই আদ্যাশক্তি। তিনি অজ্ঞান, অপ্রেম, অধর্ম্ম কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। যখনই সেই শক্তিদেবী মানুষের মনে কোন প্রকার অন্ধকার দেখিতে পান, তখনই গম্ভীর শব্দে হুঙ্কার করিয়া বলেন ;—"আবার অন্ধকার! এক অন্ধকার বিনাশ করিয়া জগৎ সৃজন করিলাম, আবার এই সৃষ্ট জগতের মধ্যে অবিদ্যা অন্ধকার আসিল!" এইরূপ হুঙ্কার করিয়া সেই মহাশক্তি কালী অজ্ঞান ও পাপের অন্ধকারকে জয় করিয়া তাহার ভিতর হইতে নূতন ধর্ম্মজগৎ উদ্ভাবন করেন। শক্তি একই। যে শক্তি সাধুদিগকে সুখ শান্তি বিতরণ করেন, সেই শক্তি পাপী অধার্ম্মিকদিগকে দলন করেন। যিনি জননী হইয়া সন্তানদিগকে বক্ষের মধ্যে রাখিয়া পালন ও পোষণ করেন, তিনিই তাঁহার পদ-তলে মহাসুরকে ফেলিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করেন। কখন জগদ্ধাত্রী হইয়া সকলকে সন্তানবৎ রক্ষা করেন। কখন করালবদনা শাণিত অসিধারিণী হইয়া ঘোর রণে দানব দলন করেন। সর্ব্ব-শক্তিময়ী মা জগজ্জননী মহাশক্তিরূপ খড়্গ দ্বারা মানব

হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা অসত্য ও অধর্ম্মকে সংহার করিতেছেন। যদি আমাদের মনের মধ্যে কুবাসনা ও দুষ্প্রবৃত্তি থাকে তবে নিশ্চয়ই সে সকল অসুরের উপরে কালীর ভীষণ অস্ত্র চালিত হইবে। যে এই শক্তিকে ঘাঁটায় সে নিশ্চয়ই মরিবে। তুমি কি মনে কর যিনি ঘোরান্ধকারের ভিতর হইতে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বাহির করিলেন তিনি তোমার পাপান্ধকার বিনাশ করিয়া আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে পারেন না? শক্তির নিকটে কোন প্রকার পাপাসুর তিষ্ঠিতে পারে না। বিশ্বাসী মনুষ্যের বক্ষের ভিতরে সেই মহাকালী জাগিয়া উঠিয়া সকল শত্রু বিনাশ করেন। যখনই হৃদয়নগরে কোন সাংঘাতিক ব্যাধি প্রবল হয় এবং জীবকে মৃত্যুগ্রাসে ফেলিবার জন্য উপক্রম করে, তখনই মহাকালী রক্ষাকালীরূপে উদিত হইয়া ব্যাধি ও মৃত্যুকে জয় করেন। রক্ষাকালীর অভ্যুদয়ে আত্মার রোগ শোক ভয় পলায়ন করে। যে অঞ্চলে মহাশক্তির পূজা হয় সে প্রদেশে পাপাসুর জীবিত থাকিতে পারে না। তিনি তাহার রক্ত বাহির করিবেনই করিবেন। শক্তিদেবী বলিদানের প্রত্যাশী নহেন, ছাগাদি রক্ত পপাসু নহেন। তিনি নরবলি চাহেন না, পাপবলি

চাহেন। জীবরক্তে তাঁহার তুষ্টি হয় না, কিন্তু পাপাসুরের রক্তে তাঁহার মহোল্লাস ও নৃত্য। যদি মহাকালীর নৃত্য দেখিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহাকে অসি দ্বারা মনের সমস্ত দানব ও অসুরের মস্তক ছেদন করিতে দেও; তিনি ঐ সকল ছিন্ন মস্তক লইয়া বিকটাকার কাটা মুণ্ড হস্তে করিয়া ভয়ঙ্করা রিপুসংহারিণী মূর্ত্তি ধরিয়া নৃত্য করিবেন। তুমি কি মনে কর কালী নির্দ্দয়-হৃদয়? শক্তিও যিনি লক্ষ্মীও তিনি। কালী কমলা একই। অন্ধকার ও অধর্ম্ম সংহার করিবার সময় তিনি ভয়ানক শক্তিরূপ ধারণ করেন, কিন্তু তাঁহাব হৃদয় সন্তানবৎসলা প্রেমময়ী জননীর ন্যায় কোমল। তাঁহাব সকল শক্তি জীবের হিতের জন্য। মা হইয়া কি তিনি আপন সন্তানের রক্ত গ্রহণ করিতে পারেন? দয়াময়ী কি নিরপরাধ ছাগ মহিষাদির শোণিতপাতে আমোদ করিতে পারেন? তিনি কেবল পাপাসুরের রক্ত চান। ভক্ত হৃদয়ে তিনি কত পাপাসুর সংহার করিতেছেন। কত লাল রক্ত নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। স্থির হইলেই মনের মধ্যে শুনিতে পাইবে মা কালীর হুঙ্কার ও দুর্ম্মতি দলন। তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য ভিতরে বসিয়া

অসুরদিগকে দলন করিতেছেন, এবং অসুররক্তে আপনার উৎসব সমাধা করিতেছেন।' আমরা শক্তি পূজা করিয়া শাক্ত হইব; ভক্তবৎসলের পূজা করিয়া ভক্ত হইব। আমরা শক্তিকে ভক্তি করিব, কেন না তিনি আমাদের জননী। তিনি রক্ষাকালী, সকলকে রক্ষা করেন। তিনি মোক্ষদায়িনী, পাপ সংহার করেন। তিনি যে কাল, সে কুৎসিত কাল নহে; সে ভাল কাল; সে অনন্তের রূপ। সেই অনন্ত শক্তিকে যত পূজা কবিবে, ততই নিস্তেজ দুর্ব্বল ভীরু নিরাশ নিরুদ্যম মন তেজস্বী হইয়া উঠিবে এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ও পাপ দমনে সমর্থ হইবে। যতই মহাশক্তি সাধন করিবে, ততই মৃত্যুকে জয় করিবে এবং অন্তরে ও বাহিরে পুণ্য-রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রকৃত শাক্ত কালিদাসের কত বিক্রম তাহা দেখাইতে পারিবে।

দুর্গা।

একটী মৃত্তিকার পাত্রে সুবর্ণ পাত্রটী বন্ধ। এই অবস্থাতে সেই পাত্র প্রতি বৎসর আমাদের দেশে আসে। আধারের বাহ্যশোভা দর্শনে নরনারী মুগ্ধ হয়। আধারের মুখ বন্ধ, কেহই আধার খুলিয়া তাহার মধ্যে কি অমূল্য ধন আছে তাহা দেখে না। সিন্ধুকের ভিতরে কোটি কোটি মুদ্রা থাকিলেও চাবি বিনা তাহার সম্ভোগ অসম্ভব ; সেইরূপ এই যে রত্নভরা মৃণ্ময় আধার বৎসর বৎসর আমাদের দেশে আসে, যাহাকে এই দেশের লোকেরা পূজা করে, ভক্তি করে, সেই আধারের ভিতরে যে চিন্ময়ী দেবী আছেন, যোগ-চাবি ভিন্ন তাহাকে খুলিয়া বাহির করিবার উপায়ান্তর নাই। মৃত্তিকার ভিতরে দেবী স্থাপন, মাটীর ভিতরে মহেশ্বরী। কি আশ্চর্য্য! ব্রহ্মাণ্ডপতি মৃত্তিকা মধ্যে! ভগবতী বাহির হইবেন মাটী ভেদ করিয়া! মৃণ্ময় পাত্র অতি সুন্দর হইতে পারে, নানা বর্ণে অনুরঞ্জিত হইতে পারে, সকলে দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে যে মহেশ্বরী বাস করেন, কাহার সাধ্য তাঁহাকে দেখিতে পায়? যোগনেত্রবিহীন হইয়া

কেহই মৃণ্ময় পাত্রে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। এই খেদ মনে রহিল যে, বঙ্গদেশে যথার্থ ভগবতীকে সাধারণ লোকে পূজা করে না। আশ্বিন মাস আসিল, কত ঘরে দুর্গা প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু বঙ্গদেশে যথার্থ জগজ্জননীকে মা দুর্গা বলিয়া কেহতো ডাকিতেছে না। বঙ্গদেশে পুতুল পূজা হইল, কিন্তু মার পূজা হইল না। যথার্থ মা মাটীতে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন। কোথায় সেই সতী? সতীপূজা করিবার জন্য সকলেই আকুল। সতীপূজার জন্য মনুষ্যস্বভাব লালায়িত। মাটীর ভিতরে সতী কল্পনা করিব কিরূপে? হিন্দুস্থান কি প্রকৃত সতীপূজা ভুলিল? আমাদিগের পরমারাধ্যা দেবী, সতী যাঁহার নাম, যাঁহার মধ্যে অনন্ত পবিত্রতা ও প্রেম ঘনীভূত হইয়াছে, কৈ তাঁহাকে কে ডাকিতেছে? সেই আদ্যাশক্তি সতী ব্রহ্মের প্রেম বিভাগ, অপরার্দ্ধ পুণ্য। এক স্বভাব যোগেশ্বর মহাদেবের স্বভাব, আর এক প্রকৃতি করুণাময়ী জননীর প্রকৃতি। সেই দেবী তাঁহার ভক্তদিগের নিকটে আপনার কোন অংশের অপমান অথবা লোপ দেখিলে সহ্য করিতে পারেন না। এই জন্যই আখ্যায়িকায় কথিত আছে, যখন যজ্ঞস্থলে মহাদেবের অপমান হইল, তখনই সতী

আপনাকে বিনাশ করিলেন। স্বামিনিন্দা সতীর নিকটে অসহ্য। দুর্গাচরিত্রে নারীর সতীত্ব প্রকাশিত। কোমলহৃদয়া সতী কোন মতেই স্বামীর অপমান সহ্য করিতে পারেন না। ব্রহ্মের কোমল প্রেম যাহা চিরকাল নারীরূপ ধরে, কদাচ ব্রহ্মের অপরার্দ্ধ পবিত্রতার অপমান সহ্য করিতে পারে না। ব্রাহ্ম-সমাজ জিজ্ঞাসা করিতেছে, সেই সতী কোথায় যাঁহার পূজা করিলে যুগপৎ পুণ্য ও প্রেম লাভ করা যায়? সমুদয় মানব-প্রকৃতি সেই সতী-চরিত্র দেখিবার জন্য ব্যাকুল। ব্রাহ্মসমাজও অসতী কলঙ্কিনীদিগের পাপরাজ্য ছাড়িয়া সতীর দিকে যাইতে চায়। যাঁহার নাম শ্রবণে জীবের পরিত্রাণ হয়, যাঁহার পূজা করিলে অশুদ্ধ এবং অসুখী মনও শুদ্ধ এবং সুখী হয়, সেই সতীপূজা ভিন্ন ভারতবর্ষের কল্যাণ নাই। এখন প্রশ্ন এই, সেই সতী কোথায়? কেহ কেহ বলে, এই আশ্বিন মাসে সেই সতী বঙ্গবাসীদের ঘরে ঘরে মাটীর আকার ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, বিশ্বজননী সতীদেবী মাটী হইতে পারেন, কিন্তু মা মাটীর ভিতরে থাকিতে পারেন। যাহার ভক্তিচক্ষু আছে সে মাটীর ভিতরেও মাকে

দেখিতে পায়, মৃণ্ময় পাত্রের মধ্যে চিন্ময়ী জননীকে দেখিতে পায়। মৃত মাটীর ভিতরে জীবনময়ী সতীকে উপলব্ধি করাই যোগতত্ত্ব। যদি মাটীর ভিতরে সতীকে দেখিতে তাহা হইলে যথার্থ দেবী পূজা কি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতে। সতী ভগবতী ব্রহ্মের প্রকৃতি। তেজোময় পুণ্যময় ব্রহ্মের কোমল প্রকৃতি, মা নামে নারী স্বভাব ধরিয়া ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হন। ব্রহ্ম আপনি আপনার কোমল প্রকৃতিকে বলিলেন, "প্রকৃতি দেবী তুমি জগতের মা হইয়া পৃথিবীতে যাও, আমি জগতের পিতা হইয়া অবতীর্ণ হইব। তুমি সুকোমল স্বভাবে জগৎকে বশীভূত কর।" মহাদেবীর অবতরণের অন্য অর্থ আর নাই। এই মা দুর্গা ব্রহ্মের প্রেমস্বরূপ, সৌন্দর্য্যস্বরূপ। যাহারা দুর্গা প্রতিমার মূলে ব্রহ্মের এই কোমল প্রকৃতি দেখে নাই, তাহারা অদ্যাপি প্রকৃত দেবীর পরিচয় পায় নাই। প্রাচীনকালে শাস্ত্রকারেরা আকারের মধ্যে ভগবতীকে বদ্ধ করিয়া এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে সমর্পণ করিয়াছেন। লোকগুলি এতকাল ভগবতীর বাহিরের আধার পূজা করিয়া আসিতেছে, এখন পর্য্যন্ত যথার্থ ভগবতীর পূজা হয় নাই। যে মন্ত্রে মৃত্তিকা পূজা হয়, তাহাতে

ভগবতী পূজা হয় না। যোগ সহকারে মৃত্তিকার আধার খোল, দেখিবে তাহার ভিতরে জীবনময়ী সতী বাস করিতেছেন এবং তাঁহার নিরাকার অঙ্গের মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতীও জাজ্বল্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এক মূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে কত মূর্ত্তি দেখিবে। বাস্তবিক ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইহারা যে তিন ব্যক্তি তাহা নহে; কিন্তু স্বয়ং ভগবতীই লক্ষ্মী ও সরস্বতী। ইহারা ভগবতীর এক একটী স্বরূপ। ভগবতী নিজেই গৃহ-লক্ষ্মীরূপে তাঁহার সন্তানদিগকে ধন ধান্য ও সুখ শান্তি বিতরণ করিতেছেন এবং তিনিই সরস্বতীরূপে অর্থাৎ বিদ্যারূপে সকলকে জ্ঞান দান করিতেছেন। ভারতবর্ষে, আর্য্য কবি ও ভাবুকেরা, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বর্ণ লইয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। ইহা কেবল উপমা। আবার যখন সুনিপুণ মূর্ত্তিনির্ম্মাতা এই উপমা লইয়া দেব দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গঠন করে, তখন উপমা প্রতিমা হয়। প্রথমে মা, পরে উপমা, তাহার পর প্রতিমা। তিনেতেই মা, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যতক্ষণ পর্য্যন্ত যথার্থ ভক্ত এ সকল উপমা ও প্রতিমা ভেদ করিয়া সৎস্বরূপা জীবিতেশ্বরী মাকে না দেখিতে পান, ততক্ষণ কিছুতেই তিনি সুখী হইতে

পারেন না। কবি উপমা উদ্ভাবন করিল, মূর্ত্তিনির্ম্মাতা প্রতিমা গঠন করিল। ভক্ত এই উপমা প্রতিমার ভিতর হইতে আবার মাকে আবিষ্কার করিলেন। আদিতে মা, অন্তে আবার মা। যথার্থ মা দুই শ্রেণীর লোকের হাতে পড়িয়া দুইটী রূপ ধরিলেন, একটী কবির অলঙ্কার শাস্ত্রের উপমা, আর একটী চিত্রকরের রচিত প্রতিমা। মার সম্পর্কে উপমা পরিত্যাগ করা শাস্ত্রকারের সাধ্যাতীত। মার যে প্রকার রূপ গুণ তাহা দেখিলে কবিত্ব অনিবার্য্য। মার শক্তি বর্ণনা করিতে হইলেই উপমা আবশ্যক হয়। যাই বলা হইল পরমা দেবী ভগবতী অসুরকুলনাশিনীর অনেক শক্তি, তখনই কবি মাকে দশভুজারূপে বর্ণনা করিলেন; দশহস্তে অলৌকিক বল প্রকাশ করিয়া মা অসুরকুল বধ করিতেছেন। যখন কবি অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে এই উপমা করিলেন, পার্শ্বে ছিল মূর্ত্তিনির্ম্মাতা, সে তৎক্ষণাৎ মার বাহু গড়িল এবং অসুর সংহারের মূর্ত্তি গঠন করিল। কবির গ্রন্থে বর্ণিত উপমা মনুষ্যের পক্ষে যথেষ্ট হইল না, এই জন্য মনুষ্যস্বভাবের স্পৃহা পূর্ণ করণার্থ চিত্রকর উপমাকে চিত্রে পরিণত করিল। অলঙ্কার-শাস্ত্রে তিনি উপমিত হইলেন, চিত্রে তিনি চিত্রিত

হইলেন। জগজ্জননীর এক পার্শ্বে সরস্বতী অর্থাৎ শুভ্র জ্ঞান এবং অপর পার্শ্বে লক্ষ্মী অর্থাৎ সুখৈশ্বর্য্যদায়িনী গৃহদেবী বিরাজ করিতেছেন। লোকে বলে লক্ষ্মী সরস্বতী জগজ্জননীর কন্যা, লক্ষ্মী সরস্বতী তাঁহার কন্যা নহেন, ইঁহারা তাঁহার সখী। কেন না জগন্মাতার জ্ঞানদায়িনী ও সন্তান-পালনী-শক্তি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই ; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির মধ্যেই স্থিতি করিতেছে। হিন্দুদিগের দুর্গা প্রতিমার মধ্যে এ সকল নিগূঢ় স্বর্গীয় ভাব নিহিত রহিয়াছে। কেবল যোগচক্ষেই এ সকল প্রকাশিত হয়, পৌত্তলিকেরা তাহা জানে না। উৎস জানে না তাহার ভিতর হইতে কেমন নির্ম্মল বারি প্রবাহিত হইতেছে। সিন্ধুক জানে না তন্মধ্যে কত রত্ন আছে। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে জগজ্জননীর এই অপরূপ রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়া এই প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার ভিতরে কত অমূল্য-রত্ন আছে বঙ্গদেশ দেখিল না। ভ্রান্ত বঙ্গদেশ, কেন তুমি মাকে উপমা ও উপমাকে প্রতিমা করিয়া জীবন্ত মাকে হারাইলে ? যিনি ত্রিজগতের জননী তিনি কি মাটী হইতে পারেন ?

চিন্ময়ী মাকে, সতীকে, দেবীকে, জগজ্জননীকে কদাচ মৃণ্ময়ী ভাবিও না, তাঁহাকে অন্তরের অন্তরে নিরাকারা আকাশরূপিণী জানিয়া তাঁহার পূজা অর্চ্চনা কর। লক্ষ্মী সরস্বতী মা হইতে ভিন্ন নহেন, এই দুই প্রকৃতি মার স্বভাবের মধ্যে সখীভাব ধারণ করিয়া আছে। যখনই মাকে দেখিবে, মার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতীকেও দেখিতে পাইবে। মা তাঁহার জ্ঞান ও বাৎসল্য প্রকৃতি ছাড়িয়া ভক্তসন্তানের নিকট প্রকাশিত হইতে পারেন না। মাকে দেখিলে, মার পূজা অর্চ্চনা করিলে, অথচ তোমার জীবনে অজ্ঞান অন্ধকার দুর্ভাগ্য দুর্গতি রহিল, ইহা হইতে পারে না। প্রকৃত মাকে দেখিলেই তাঁহার সরস্বতী এবং লক্ষ্মী প্রকৃতি আসিয়া তোমার অজ্ঞান ও দুর্গতি হরণ করিবে, করিবেই করিবে। মা তাঁহার দিব্যজ্ঞান প্রত্যাদেশ ও শাস্ত্র সকল ছড়াইতে ছড়াইতে তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে অবতরণ করেন। জ্ঞান ব্রহ্ম-প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত, ব্রহ্ম হইতে জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার না। যখন চিন্ময়ী জগজ্জননী আপনার প্রাণের ভিতর হইতে নিগূঢ় সত্য, যোগভক্তিসম্বন্ধীয় বিবিধ রহস্য, প্রত্যাদেশ, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশ করেন, তখন

তাঁহার আর এক ভাব জগতের কল্যাণের জন্য সেই জ্ঞানরাশি লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। যাঁহারা প্রেমের সহিত ব্রহ্মপূজা করেন তাঁহারা জানেন যিনি দুর্গা তিনি সরস্বতী ; অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম তিনিই জ্ঞানদাতা। মা বেদ বেদান্ত শাস্ত্রাদি বলিতেছেন, আর গণেশ সে সমস্ত জগতে বিস্তার করিতেছেন। ভাবিবার জন্য জ্ঞানকে স্বতন্ত্র মনে করিতে পার, সরস্বতীকে ভগবতীর পার্শ্ববর্ত্তিনী মনে করিতে পার ; কিন্তু বাস্তবিক ব্রহ্ম এবং তাঁহার জ্ঞান, ভগবতী এবং সরস্বতী একই। যখনই সত্যভাবে ভক্তির সহিত মার পূজা করি তখনই দেবীর উক্তি শুনিতে শুনিতে নূতন নূতন শুভ্র জ্ঞান লাভ করি। যখনই দুর্গা দর্শন তখনই সরস্বতীরূপ দর্শন ; যেমন ব্রহ্মদর্শন তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের সঞ্চার। জগজ্জননী যেমন অসুর-সংহারিণী দুর্গা, তেমনি জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী। যখন তিনি সত্য প্রকাশ করেন তখন তাঁহার সরস্বতী মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। যদি কেহ ভ্রান্ত হইয়া উপমাকে প্রতিমা মনে করে, অলঙ্কারকে সত্য মনে করে, তবে তাহারই দোষ। জগজ্জননীর যে কেবল সরস্বতী এক সখী তাহা নহে, তাঁহার আর এক সখী লক্ষ্মী। যে ভক্তের বাড়ীতে

মার আবির্ভাব হয়, সেখানে মার সঙ্গে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়। মা লক্ষ্মীরূপা, শ্রীস্বরূপা। বিশ্রী দেবী, লক্ষ্মীবিহিন দেবী কি কেহ কল্পনা করিতে পারে? ভুবনমোহিনী মা কি বিবর্ণা কদাকারা? যে নরনারীর হৃদয় মধ্যে মা ভগবতীর আবির্ভাব হয়, সেই নরনারীর লক্ষ্মী শ্রী অর্থাৎ সৌভাগ্য বৰ্দ্ধিত হয়। নাস্তিক পাষণ্ডের সংসারকে কদাচ লক্ষ্মীর সংসার মনে করিও না। যে দস্যু দশ হাজার মানুষ কাটিয়া ধনী হইল, তাহার সংসারকে কি লক্ষ্মীর সংসার বলিবে? ভক্ত যদি দরিদ্র হন তথাপি তাঁহার সংসার লক্ষ্মীর সংসার। ভক্তের কুটীরে সামান্য অবস্থার মধ্যে সুখ স্বচ্ছন্দতা। ভক্ত শাকান্ন আহার করিয়াও হাসিতেছেন। লক্ষ্মীর সংসার দেখিলেই বুঝা যায়। ঈশ্বরকে লাভ করিয়া কেহই লক্ষ্মী ছাড়া হইতে পারে না। পৃথিবীতে এমন একটীও লোক জন্মগ্রহণ করে নাই, যে ঈশ্বরের পূজা করিয়া লক্ষ্মীবিহীন হইয়াছে। লক্ষ্মীর আগমনে ভক্তের সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি ও অকল্যাণ দূর হয়। যাহার বাটীতে দুর্গতিনাশিনী অবতীর্ণ হয়েন, তাহার সংসারে আপনাপনি লক্ষ্মীশ্রীর অভ্যুদয় হয়। যিনি ভক্তের আত্মার পাপ বিনাশ করেন, তিনি

পার্থিব অকল্যাণও দূর করেন। কার্ত্তিক মূর্ত্তিরও অর্থ আছে। যে বাড়ীতে কার্ত্তিকের অধিষ্ঠান, সে বাড়ীতে অলক্ষ্মী, দুর্ভাগ্য আসিতে পারে না। কার্ত্তিক যুদ্ধের তীক্ষ্ণবাণ দ্বারা সরস্বতীর বিরোধী ও লক্ষ্মীর বিরোধী অকল্যাণ সমুদয় বিনাশ করেন। পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিনা মার জয় হয় না। কার্ত্তিক সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করেন, এবং মার ভক্ত-দিগকে রক্ষা করেন ও পুণ্যরাজ্য বিস্তার করেন। হে মূঢ় ব্রাহ্ম, তুমি ব্রহ্ম পূজা করিলে, অথচ তোমার সংসারে শ্রীবৃদ্ধি হইল না, তুমি অবিদ্যা পাপের উপর জয় লাভ করিলে না, তোমার শত্রুদল প্রবল রহিল, তবে তুমি কার্ত্তিকের পরাক্রম দেখিতে পাইলে না। তাহা হইলে, তোমার প্রকৃত মহাদেবীপূজা হয় নাই। সাধক, যদি তুমি ভগবতীর মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্ত্তিক গণেশ এ সকল দেখিতে না পাও তবে তুমি হিন্দু নহ, ব্রাহ্ম নহ। যদি তুমি যথার্থ হিন্দু অথবা যথার্থ ব্রাহ্ম হও, তবে যোগ দ্বারা পুতুলের বক্ষ খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে চিন্ময়ী মা, তাঁহার সখী এবং সন্তানদিগকে বাহির কর। যেদিন তোমার স্তব স্তুতিতে ব্রহ্মপ্রসাদে তোমার চরিত্রে মাটীর দুর্গার পরিবর্ত্তে

চিন্ময়ী দুর্গা প্রকাশিত হইবেন, সেই দিন তোমার দেশের সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইবে মৃন্ময় সিন্ধুকের ভিতরে চিন্ময় পদার্থ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সেই সিন্ধুক খুলিয়া সতীদেবীকে বাহির কর এবং মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সেই জীবিতেশ্বরী সত্যদেবীকে অসুর-নাশিনী, জ্ঞানস্বরূপা, কল্যাণদায়িনী এবং শান্তি ও জয়প্রসবিনী বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা কর। ব্রাহ্ম, তোমার হাতে ঈশ্বর প্রকাণ্ড ভার সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি যোগসন্ধানে দুর্গা প্রতিমার ভিতর হইতে স্বর্গীয় রত্ন সকল বাহির করিয়া আপনি দেখিবে ও সম্ভোগ করিবে এবং তোমার হিন্দু ভ্রাতৃ ভগ্নীদিগকে দেখাইবে। হিন্দু ভ্রাতার সিন্ধুক খুলিয়া তাঁহাকে তাহার সিন্ধুকভরা রত্ন সকল দেখাইয়া মোহিত করিবে। মাটীর দুর্গা কেবল একটী সিন্ধুক, ইহার ভিতরে মা তাহার সখী এবং সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া বিরাজ করিতেছেন। অতএব হিন্দুস্থান, মৃত মাটীর পূজা পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ জীবিতেশ্বরী চিন্ময়ী মহাদেবীর পূজা কর।

লক্ষ্মী।

তোমরা কি কখনও কাচের টাকা ব্যবহার করিয়াছ ? তোমরা এই পৃথিবীতে এত দিন আছ, কখন কি কাচের অন্ন খাইয়াছ ? যদি কাচের টাকা দেখিতে, যদি কাচের অন্ন খাইতে, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে ধন ধান্যের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতে। এক প্রকার টাকা আছে যাহা স্বচ্ছ নহে, তাহাতে দেশের রাজা কিংবা রাণীর মুখ অঙ্কিত থাকে। আর এক প্রকার টাকা আছে যাহাতে বিশ্বমাতা ভুবনেশ্বরী যিনি, তাঁহার মুখ লেখা আছে। পূর্ব্বোক্ত টাকা হস্তে স্পর্শ করিলে হস্ত বিষাক্ত হয়, মনে হয় যেন কি দুষ্কর্ম্ম করিলাম। আর শেষোক্ত টাকা হাতে করিলে শরীর শুদ্ধ হয়। ঈশ্বরপ্রদত্ত ধন পবিত্র ধন, সেই ধন স্পর্শমাত্র শরীর মনে পুণ্যের সঞ্চার হয়। এক প্রকার অন্ন আছে যাহা রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ সকলেই খায়, সেই অন্ন খাইলে শরীর সবল হয় ; কিন্তু শরীরের বলের সঙ্গে সঙ্গে বিলাস ও সুখস্পৃহা বৃদ্ধি হয়। সংসারী ব্যক্তিরা কেবল উদর পূরণের জন্য ও ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য সেই অন্ন আহার

করে। আর এক প্রকার অন্ন আছে, যাহা হাতে করিবামাত্র শরীর পবিত্র হয় এবং যাহার মধ্যে স্বয়ং লক্ষ্মীর আবির্ভাব অনুভূত হয়। সেই অন্নে লক্ষ্মী-নাম অঙ্কিত থাকে এবং তাহার মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী দেখা যায়। যখনই ভক্তির সহিত সেই অন্ন মুখে দেওয়া যায়, তখনই আঃ বলিয়া শরীর মন জুড়ায়। সেই অন্ন আহার করিলে দেহমধ্যে ব্রহ্মতেজ উৎপন্ন হয় এবং এরূপ স্বর্গীয় উৎসাহে মন উদ্দীপ্ত হয় যে, বোধ হয় যেন স্বর্গের আগুন শরীর মনের মধ্যে জ্বলিতেছে। একটী চাল খাইলেই সমস্ত রক্ত পবিত্র হয় এবং সেই রক্ত এমনই উষ্ণ হইয়া উঠে যে, ইচ্ছা হয় এখনই সৎকার্য্য করি, সমস্ত দিন প্রাণপণে পরিশ্রম করি এবং ব্রহ্মের আজ্ঞা পালন করি। হে ব্রহ্মসাধকগণ! যদি তোমরা এইরূপ কাচের ন্যায় স্বচ্ছ টাকা এবং কাচের ন্যায় স্বচ্ছ অন্ন ব্যবহার কর, তাহা হইলে অতি সহজে তোমরা ব্রহ্মধামে যাইতে পারিবে। যদি অন্য প্রকার টাকা এবং অন্ন ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমাদের অধোগতি হইবে। সংসারের দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবার সময় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবে উহা স্বচ্ছ কি না এবং উহার ভিতর লক্ষ্মীমূর্ত্তি দেখা যায় কি না। যদি দেখ

যায়, উহা ব্যবহার করিবে। যে বস্তুতে ঈশ্বরকে দেখা যায় না, তদ্ব্যবহারে মহা অনিষ্ট। কেহ কেহ মনে করেন টাকা স্পর্শ করা কিংবা স্ত্রীর মুখ দর্শন করা পাপ, সংসার নরক এবং শ্মশান বৈকুণ্ঠ। এই মতানুসারে যেখানে গৃহস্থেরা সুখে বাস করে, যেখানে কুবেরের ধন সম্পত্তি, যেখানে রাজার রাজভাণ্ডার, সেখানেই অসুরের বাসস্থান। অতএব জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন গহন বনে গমন করিয়া ধর্ম্ম সাধন করা, সমস্ত দিন উপবাস ও শরীরকে নির্য্যাতন করিয়া কঠোর তপস্যা করা আবশ্যক। যোগী ঋষি অথবা তপস্বী হইতে হইলে শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ করিতে হইবে। এই সন্ন্যাসধর্ম্মে শরীর পতনই মন্ত্রের সাধন। এই ভ্রান্ত মত ছেদন করিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে নববিধানের অভ্যুদয়। নববিধান এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, ধন ধান্য এবং সংসারের সমুদয় বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের সিংহাসন বিরাজিত। সংসারশ্রীতে ইনি লক্ষ্মীশ্রী দেখেন। নববিধানের লোক হইয়া তোমরা কোন মতেই ধন ধান্যকে ঘৃণা করিতে পার না, সাংসারিক সুখ সম্পদকে অপবিত্র মনে করিতে পার না। ধন ধান্য স্বয়ং লক্ষ্মীর হস্তের দান। যেমন ব্রহ্মমন্দিরে

প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরাৎপর ব্রহ্মের পূজা করিতেছ, তেমনি সংসারে প্রবেশ করিয়া ধনধান্যদায়িনী সংসারের কর্ত্রী গৃহদেবী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর পূজা করিবে। যে দেবতা এই ব্রহ্মমন্দিরে তোমাদিগের পূজা গ্রহণ করেন, ইনিই তোমাদের প্রতিজনের গৃহে গৃহলক্ষ্মী হইয়া বাস করিতেছেন। যিনি আমাদিগকে আহার করাইবার জন্য পৃথিবীকে উর্ব্বরা এবং প্রচুর শস্যশালিনী করিলেন ও নানাবিধ সুখৈশ্বর্য্যে সুসজ্জিত করিলেন, তিনি কি আমাদিগের জন্য উপবাসবিধি প্রচার করিতে পারেন? উপবাসের ধর্ম্ম বাস্তবিক উপহাসের ধর্ম্ম। যিনি অন্ন সৃজন করিলেন, তাঁহার কি ইচ্ছা নহে যে আমরা সেই অন্ন আহার করি? যিনি অন্নদা অন্নপূর্ণা, তিনি কি অন্নকে বিষনয়নে দেখিতে পারেন? তোমরা কি মনে কর যেখানে লোকালয় নাই, যেখানে শ্মশান, যেখানে ভীষণ মৃত্যু মনুষ্যের হাড় লইয়া ঘোর অন্ধকারের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, যেখানে কেবল শোক এবং ভয়, সেখানেই কেবল যোগেশ্বর মহাদেব বাস করেন? তিনি কি সংসারকে ঘৃণা করেন? মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব শ্মশানবাসী এবং শ্মশান মধ্যে সাধকদিগকে বৈরাগ্য

শিক্ষা দেন ইহা সত্য ; কিন্তু তিনি কেবল শ্মশানবাসী নহেন, তিনি আবার পরিবার মধ্যে গৃহ দেবতা হইয়া সন্তান পালন ও সংসার নির্ব্বাহ করেন। ঈশ্বরের দ্বিমূর্ত্তি, এক দিকে ঘোর সন্ন্যাসীর মুখ, অপর দিকে ঘোর সংসারীর মুখ। তিনি এক ভাবে বৈরাগী উদাসীন সন্ন্যাসাদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্মশান মশানে, বন উপবনে, পাহাড় উপত্যকায় এবং নদ নদীতটে বেড়াইতেছেন ; আর এক ভাবে লক্ষ্মীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকেশ্বরী হইয়া লোকালয়ে বাস করিতেছেন। আমাদের প্রাণের হরি যেমন নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী, তেমনি ব্যস্ত সংসারী। যিনি জীবকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেন, তিনিই তাহাকে গৃহধর্ম্ম শিক্ষা দেন। তিনি সামান্য সংসারী নহেন। এক একবার জাগ্রত হইয়া সংসারে আসেন ও আবশ্যকমত দুই একটি কার্য্য করেন এরূপ নহে। তিনি ঘোর সংসারী, সমুদয় সৃষ্টি তিনি রক্ষা করিতেছেন। কোটী কোটী জীব তাঁহার সংসারে, নিয়ত তাহাদিগকে তিনি পালন করিতেছেন। তিনি যেমন সংসারে ডুবিয়া আছেন এমন আর কেহই ডুবিতে পারে নাই। হে ক্ষীণ বিশ্বাসি, তুমি কি মনে কর মহেশ্বর কেবল কৈলাস শিখরে অথবা শ্মশানে একাকী

বাস করেন কিন্তু লোকালয় তাঁহার অগম্য? তুমি কি মনে কর তিনি ভূগোল পাঠ করেন নাই, পৃথিবীতে অন্য অন্য স্থান যে আছে তাহা তিনি জানেন না, যেখানে যোগী সন্ন্যাসীরা তাঁহার আরাধনা করেন কেবল সেই স্থানই তিনি জানেন এবং সেখানেই থাকেন? বাস্তবিক তুমি কি মনে কর তিনি বিরলে বসিয়া যুগ যুগান্তরে এক আধ খানি বেদ বেদান্ত, বাইবেল কোরাণ, ভাগবত পুরাণ লেখেন; এতদ্ব্যতীত তিনি আর কিছু জানেন না, আর কিছু করেন না, সংসারের কোন শাস্ত্র তিনি পড়েন নাই, সুতরাং বিষয় কর্ম্ম কিছুই জানেন না? অল্পবিশ্বাসী মনুষ্য, তোমার ভ্রান্ত বুদ্ধি কিরূপে ইহা কল্পনা করিল যে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ? তুমি কি মনে কর ঈশ্বর বাণিজ্যব্যবসায় বুঝেন না, টাকা কড়ির হিসাব করিতে পারেন না, অথবা দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে কিরূপে তাহার প্রতিবিধান করিতে হয় তাহা তিনি জানেন না? তুমি কি সিদ্ধান্ত করিয়াছ যে, জলকষ্টে কি অন্নকষ্টে কোন দেশ জর্জ্জরিত হইয়া যদি তাঁহার নিকট আসিয়া প্রতিবিধানের উপায় জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে তিনি সরল অন্তরে তাহাকে এই উত্তর দিবেন; "আমি বেদ বেদান্ত

প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র জানি, কিন্তু রাজ্যপালনসম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্ব আমি কিছুই বুঝি না, কিসে জলকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ নিবারণ হয় তাহা আমি জানি না, এ সকল সাংসারিক বিষয়ে আমি সৎপরামর্শ দিতে পারি না।" অনেকের এরূপ প্রতীতি হইয়াছে যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে সুশিক্ষিত মনে যে সকল সন্দেহ উত্থিত হয়, তাহা সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের পুস্তক পাঠ না করিলে মীমাংসিত হয় না এবং জগদীশ্বর যিনি কেবল বিশ্বাস ও ভক্তি বুঝিতে পারেন, তিনি এ সকল বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান দিতে পারেন না। হে বিভ্রান্ত বিষয়ী মানব, তুমি কি মনে কর যদি ঈশ্বরকে সংসারের কোন ভার দেওয়া যায় নিশ্চয়ই তিনি বিপদ ঘটাইবেন? তোমার কল্পিত ঈশ্বর সংসার চালাইতে অক্ষম, তাঁহাকে যদি বাজারের ভার দাও তিনি হয়তো কাষ্ঠ আনিতে গিয়া লবণ আনিবেন না, অথবা তণ্ডুল ক্রয় করিতে গিয়া ঘৃত ও তৈল আনিতে ভুলিবেন, কিংবা হয়তো অল্প মূল্যের সামগ্রী অনেক মূল্যে ক্রয় করিয়া ঠকিয়া আসিবেন, অথবা বাজারে ভাল সামগ্রী বাছিয়া কিনিতে পারিবেন না। বাস্তবিক অল্পবিশ্বাসী মানুষ মনে করে ঈশ্বর জীবকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন,

পরিত্রাণ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি সংসারের বিষয় কিছুই বুঝেন না; সাংসারিক বিষয়ে মনুষ্যেরই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অধিক। এইরূপ ভ্রমান্ধ হইয়া কত অবিশ্বাসী মানুষ আপন ভাণ্ডারের চাবি ও সংসারের ভার আপনার হস্তে রাখে, দেবহস্তে কেবল আত্মার ভার অর্পণ করে। তাহাদিগের মতে ঈশ্বর কেবল নিমতলার শ্মশান ঘাটে কতকগুলি বৈরাগী ও সন্ন্যাসী-দিগের সঙ্গে থাকেন, আর কোন স্থানে তাঁহার গতি নাই। কল্পিত সন্ন্যাসী শ্মশানবাসী দেবতার উপাসকেরা এইরূপে ধর্ম্মকে উপহাসের বিষয় করে, কিন্তু ঈশ্বরের যথার্থ ধর্ম্ম—নববিধানের ধর্ম্ম অন্য প্রকার। ধর্ম্ম কেবল শবশাধন ও ভস্ম লেপন নহে, গৈরিক ও কমণ্ডলু ইহার সার নহে। ইহার সাধনক্ষেত্র শ্মশানে বদ্ধ নহে। কিন্তু সংসারের প্রত্যেক ব্যাপারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সংসারের প্রত্যেক পদার্থ মধ্যে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। বিশ্বাসচক্ষে দেখিলে সংসারের যাবতীয় বস্তু কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া স্পষ্টরূপে লক্ষ্মীকে প্রকাশিত করে। যেমন কাচের আচ্ছাদনে সুন্দর মূর্ত্তি সকল ঢাকা থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক পদার্থরূপ স্বচ্ছ কাচের মধ্যে জগজ্জননী লক্ষ্মী বাস করিতেছেন।

কি অন্ন বস্ত্রে, কি শয্যা পর্য্যঙ্কে, কি তৈজসাদিতে সংসারের সকল দ্রব্যে মা লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। শরীরের রক্তের মধ্যে, সুস্থতা ও বলের মধ্যে, সুখসম্পদের মধ্যে লক্ষ্মী নৃত্য করিতেছেন। গৃহস্বামীর ধন মান বিভবের মধ্যে, গৃহকর্ত্রীর সৌন্দর্য্য অলঙ্কারের মধ্যে, দাসদাসী অশ্বরথ মধ্যে স্বয়ং লক্ষ্মী আপনার শ্রী প্রকাশ করেন। স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি ঈশ্বর লক্ষ্মীরূপে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে বাস করিতেছেন এবং দিবানিশি সংসারের ক্ষুদ্রতম কার্য্য পর্য্যন্ত স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতেছেন ও তাবৎ প্রয়োজনীয় বস্তু বিধান করিতেছেন। জগজ্জননী নিজে তাঁহার সন্তানের গৃহে পরিচারিকা হইয়া সেবা করিতেছেন। ভক্ত তাঁহার সংসারের যে কোন বস্তুর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই বস্তুর মধ্যেই লক্ষ্মীর সিংহাসন দেখিতে পান। সুতরাং সকল বস্তুকেই তিনি পবিত্র মনে করেন। লক্ষ্মী যদি এক মুষ্টি অন্ন দেন তাহা তিনি আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন, এবং কোটী টাকা অশ্ব গজ যদি দেন তাহাও আদরের সহিত লক্ষ্মীর দান বলিয়া গ্রহণ করিবেন। লক্ষ্মীর ভক্তসন্তান লক্ষ্মীর দেওয়া গাড়ীর উপরে চড়িয়া দেখিলেন স্বয়

লক্ষ্মী স্বহস্তে সেই গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং সারথির কর্ম্ম করিতেছেন। ভক্ত তখনি গল-বস্ত্র হইয়া বলিলেন "মা লক্ষ্মী তোমাকে প্রণাম" এই বলিয়া সেই রথে চড়িয়া লক্ষ্মীর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মীর গাড়ীতে চড়িলে নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর বাড়ীতে যাইবেন। কিন্তু যদি এক খানি বিলাসের গাড়ী নিজে নির্ম্মাণ করিয়া সেই লক্ষ্মীছাড়া নিরীশ্বর গাড়ীতে আরোহণ কর তাহা হইলে নিশ্চিত নরকের দিকে গতি হইবে। লক্ষ্মীদত্ত, লক্ষ্মীনামাঙ্কিত হাজার টাকার শাল গায়ে দেও, তাহার প্রত্যেক পশমের ভিতর হইতে পবিত্রতা তোমার অঙ্গে প্রবেশ করিবে। আর যদি লক্ষ্মী-বিহীন, ঈশ্বরবিহীন শাল ব্যবহার কর, তাহাতে মন অহঙ্কৃত ইন্দ্রিয়াসক্ত এবং অপবিত্র হইবে। কেহ শাল পরিয়া যমালয়ে যায়, কেহ রাজর্ষিদের ন্যায় ঐ গাত্রাবরণ পরিধান করিয়া উহার মধ্যে লক্ষ্মীর আবির্ভাব অনুভব করেন। হে সাধক, তোমার কি বাড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে? তুমি লক্ষ্মীর হাতে ভার দেও। পৃথিবীতে অনেক গৃহনির্ম্মাতা আছে; কিন্তু সাবধান! তুমি কদাপি মানুষের নির্ম্মিত বাড়ীতে বাস

করিবে না, লক্ষ্মীর বাড়ীতে যাইবে, লক্ষ্মীর সংসারে থাকিবে। সেই বাড়ীর প্রত্যেক ইটের মধ্যে লক্ষ্মীর নাম অঙ্কিত দেখিবে, কেন না স্বয়ং লক্ষ্মীর হস্তে উহা নির্ম্মিত। তিনি কি বাটী নির্ম্মাণ করিতে জানেন ? হাঁ, আমি বলিতেছি জানেন, খুব ভাল জানেন, আমাদের সকলের অপেক্ষা ভাল জানেন। কি প্রণালীতে গৃহ গঠন করা বিধেয়, কত টাকা লাগিবে, দালান বারাণ্ডা কিরূপ হইবে, ভক্তের সমস্ত অভাব কিরূপে মোচন হইবে, তৎসমুদয় ভক্তবৎসলা লক্ষ্মী যেমন জানেন এমন আর কে জানে ? অতএব তাঁহাকে অনভিজ্ঞ মনে করিয়া নাস্তিক অহঙ্কারীর ন্যায় আপন হস্তে গৃহগঠনের ভার লইবে না, কিন্তু জননী লক্ষ্মীর উপর সে ভার ন্যস্ত করিবে। তিনি উপযুক্ত-রূপে তোমার গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন, সাজাইয়া দিবেন, রক্ষা করিবেন ও উহাকে ধর্ম্মের আলয় করিয়া দিবেন। লক্ষ্মী আহার দেন, লক্ষ্মী বাড়ী দেন, লক্ষ্মী সকল অভাব মোচন করেন। লক্ষ্মী তোমার অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া দেন, লক্ষ্মী তোমার ঘর পরিষ্কার করেন, লক্ষ্মী তোমার ভাণ্ডার রক্ষা করেন, লক্ষ্মী তোমার শস্যক্ষেত্রে শস্য এবং তোমার

বাগানে ফুল ফল উৎপাদন করেন, লক্ষ্মী তোমার জমিদারীর সুব্যবস্থা করেন। যিনি ব্রহ্মমন্দিরের দেবতা তিনিই তোমার বাড়ীর লক্ষ্মী। গুরু হইয়া এখানে তোমাকে যোগ ভক্তি শিখাইলেন, বাটীতে গিয়া জননীরূপে তোমার সংসার পালন করিবেন। তাঁহাকে সমস্ত ভার দেও, তিনি যাহা করিলেন সে সকলই তোমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে। ধনোপার্জ্জন, স্বাস্থ্য-সাধন, বাণিজ্য ব্যবসায়, গৃহরক্ষণ ও সন্তানপালন প্রভৃতি সমুদয় কর্ম্মের ভার সেই সুদক্ষ গৃহদেবতার হস্তে অর্পণ কর, কুশল ও শান্তি পাইবে। লক্ষ্মী যে বিধি করেন তাহাই মঙ্গল বিধি। যাহা কিছু লক্ষ্মী দেন তাহাই তোমার কল্যাণের হেতু। করুণাময় ঈশ্বর, মঙ্গলময় বিধাতা কখনও আমাদের অমঙ্গলের জন্য সংসার স্থাপন করেন নাই। অন্ন বস্ত্র, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব তিনি যাহা কিছু আমাদিগকে দিতেছেন সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য। কিসে আমার মঙ্গল, কিসে অমঙ্গল, সংসারের কোন্ কার্য্য করিলে আমার ভাল হইবে কোন কার্য্যে অনিষ্ট হইবে ইহা আমি জানি না, তিনি জানেন। সুতরাং তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া সমস্ত সংসার তাঁহার চরণতলে রাখিতে হইবে। তিনি

ঘোর সন্ন্যাসীর ন্যায় নির্লিপ্ত এবং নির্ব্বিকার, সৃষ্ট কোন বস্তুর প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই, তিনি সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী ; কিন্তু সন্তানদের মঙ্গলের জন্য তিনি ঘোর সংসারীর ন্যায় গৃহদেবতা মা লক্ষ্মী হইয়া তাহাদিগকে আদর করিয়া পালন করেন এবং নানা প্রকার সুন্দর ও সুমিষ্ট বস্তু সকল বিতরণ করেন। মা যেমন সুন্দররূপে সংসার নির্ব্বাহ করেন তেমন আর কেহই পারেন না। মা যেমন সংসারী এমন আর কে আছে। তবে কেন, হে ভক্ত, তুমি জগজ্জননীকে সংসারী বলিয়া, গৃহলক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিবে না এবং সকল বিষয়ে কেন তাঁহার সদুপদেশ লইবে না ? আত্মীয় বন্ধু এবং পরিবার প্রতিপালন করিবার জন্য যদি তোমার অর্থোপার্জ্জন করা আবশ্যক হয়, ভক্তির সহিত লক্ষ্মীর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া তাঁহার সৎপরামর্শ গ্রহণ করিবে। তোমার বিদ্যা বুদ্ধি তিনি সকলই জানেন এবং কিরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে তোমার ধর্ম্ম অর্থ দুই সঞ্চয় হইবে ইহা তিনি বুঝাইয়া দিবেন। কিরূপে আয়ব্যয় বিবরণ রাখিতে পার তাহাও স্বয়ং লক্ষ্মী দেখাইয়া দিবেন। তিনি বড় বড় সাহেব এবং গণিতশাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতদিগের অপে-

ক্ষাও ভাল হিসাব রাখিতে পারেন। তোমার সংসারে যদি দ্রব্যাদি ভাল করিয়া সাজাইতে চা'ও লক্ষ্মীকে বলিও, তিনি তাহাও কবিয়া দিবেন; লক্ষ্মীর সংসারে কোন প্রকার গোলমাল এবং বিশৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগের হিন্দু ভ্রাতাগণ বিশ্বাস করেন, যাঁহার সংসারে সুব্যবস্থা আছে তাঁহার সংসার লক্ষ্মীর সংসার এবং যে সংসারের সমস্ত বিশৃঙ্খল এবং শোভাহীন, সে সংসার লক্ষ্মী-বিহীন। ব্রাহ্ম, তুমি সাকার লক্ষ্মী মান না এবং কোন কালে মানিবে না। মূর্ত্তিপূজা তোমাব ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বরের ধন-ধান্যদায়িনী কল্যাণ-বিধায়িনী সন্তানপালনীশক্তি তুমি অস্বীকার করিতে পার না। সেই নিরাকারা শক্তিই লক্ষ্মী। তুমি তাঁহার অপমান করিও না। লক্ষ্মীকে হিন্দু এতদূর আদর করেন যে, তাঁহাকে ঠাকুরঘরে বদ্ধ না করিয়া প্রতি ঘরে তাঁহার পদচিহ্ন স্থাপন করেন। তিনি আলেপন দ্বারা প্রতি ঘরে লক্ষ্মী পদচিহ্ন চিত্রিত করেন এবং মনে করেন যে, সংসারের দেবী সর্ব্ব ঘরে বেড়াইতেছেন। তোমরা বিশ্বাস কর যে, সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্ম লক্ষ্মীরূপে অর্থাৎ সাংসারিক শ্রীরূপে

সকল ঘরে, সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। লক্ষ্মীর অর্থ শ্রী। হে ব্রাহ্ম, হে ব্রাহ্মিকা, তোমরা আপন আপন সংসার লক্ষ্মীর সংসার করিয়া লক্ষ্মীমান্ ও লক্ষ্মীমতী, শ্রীমান্ ও শ্রীমতী হও। ব্রহ্মের লক্ষ্মী-রূপ সাধন কর। পাপাসুরনাশিনী বিশ্বজননী মহাদেবী উভয় পার্শ্বে সরস্বতী ও লক্ষ্মীরূপ ধারণ করিয়া ভক্ত সংসারে অবতীর্ণ হন এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। সরস্বতীরূপে তিনি তোমাদিগকে জ্ঞান এবং বিদ্যা, লক্ষ্মীরূপে তিনি তোমাদিগকে সংসারের শ্রী সৌভাগ্য দান করিবেন। সাকার ভাব বিসর্জ্জন দিয়া নিরাকার ভাবে তোমরা ঈশ্বরের এই দুই প্রকৃতি গ্রহণ কর ও যত্নপূর্ব্বক সাধন কর। জগজ্জননী স্বয়ং লক্ষ্মী এবং সরস্বতী হইয়া তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। তিনি মা হইয়া বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিয়া সন্তানের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। অন্তরের অন্তরে সেই নিরাকারা সরস্বতী এবং লক্ষ্মী পূজা করিয়া দিব্যজ্ঞান ও পরাবিদ্যা এবং নিত্য কল্যাণ ও শ্রী অর্জ্জন কর। সংসারের ভিতরে জগজ্জননী মা লক্ষ্মীর শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া সপরিবারে শুদ্ধ এবং সুখী হও।

সরস্বতী।

আমার অন্তরে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, সত্যের শত্রুদিগকে আমি পরিণামে দেবপ্রসাদে পরাজয় করিব। যাহারা সত্যবিরোধী, যাহারা ঈশ্বর-বিধান-বিরোধী, তাহারা কখনই জয় লাভ করিতে পারিবে না আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস। আক্রমণ-কারী শ্রেণীর মধ্যে প্রধান শত্রুদলে তাহারা, যাহারা একপ্রকার পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া দুষ্টবুদ্ধি সহকারে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আর এক প্রকার পৌত্ত-লিকতা আনয়ন করিতেছে। সামান্য মূর্ত্তিউপাসক-দিগের অপেক্ষা তাহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়. যাহারা মুখে আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয় কিন্তু চলে না, বলে না, নড়ে না, জীবনের লক্ষণ দেখায় না এমন এক কল্পিত ব্রহ্মছায়া পূজা করে। হে জ্ঞানাভিমানী ব্রাহ্ম, তুমি কি সে অসার মৃত পদার্থকে ব্রহ্ম বলিতেছ, যে পদার্থ সহস্র প্রার্থনার একটি উত্তরও দিতে পারে না, যে পদার্থ কথা বলিতে নিতান্ত অক্ষম? এমন অসৎ অসার কল্পিত বস্তুকে ব্রহ্ম নাম দিও না। যে বস্তুর কথা কহিবার শক্তি

নাই, যাহা ভক্তের প্রার্থনার উত্তর দিতে পারে না, তাহা কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না। ব্রহ্ম যিনি তিনি বাক্য-স্বরূপ, তাঁহার নাম বেদ। যে বাক্য নহে, যে কথা কহে না, সে তো মিথ্যা কল্পিত দেবতা। সেই মিথ্যা কল্পনা পৃথিবীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মনুষ্যমন হইতে প্রসূত হইয়াছে। যে ঈশ্বর উপদেশ দেয় না, যে ঈশ্বর পাপের প্রতিবাদ করে না, যে ঈশ্বর পাপের দণ্ড দেয় না, সে ঈশ্বর অসৎ এবং ভয়ানক অকল্যাণের হেতু। যদি তুমি এক প্রস্তর খণ্ডকে দেবতা বলিয়া স্বীকার কর এবং ঐ পাথরের সমক্ষে মিথ্যা বল, প্রবঞ্চনা কর, নরহত্যা কর, ঐ পাথর তোমাকে ভৎর্সনা করিবে না। পাথর কি কথা কহিতে পারে? না কখন কথা কহিয়াছে? সুতরাং পাথরকে তুমি ভয় করিবে কেন? উহার সমক্ষে তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার। দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ হইবে বলিয়া বুঝি তুমি এমন এক বাক্যহীন পাথরের ন্যায় ব্রহ্ম কল্পনা করিয়াছ যে তোমাকে কিছুমাত্র শাসন করিতে পারিবে না। তুমি তোমার শাণিত কুবুদ্ধির অস্ত্রে বাক্যস্বরূপ ব্রহ্মের রসনাটী

কাটিয়াছ, তুমি বলিতেছ তোমার ব্রহ্ম কথা কহেন না। কি আশ্চর্য্য! কি ভয়ানক চতুরতা! তুমি আপনি আপনার দেবতার রসনা কাটিলে, এখন বলিতেছ ঈশ্বর কথা কহেন না! তোমার ভয়ানক মত কেবল স্বেচ্ছাচারী শাসনবিমুখ ব্যক্তিদিগের নিকট আদরনীয় হইতে পারে কিন্তু উহা কখনই ঈশ্বরের রাজ্যে জয়লাভ করিতে পারে না। যাহারা মনে করে ঈশ্বর কথা কহেন না, তাহারা যথার্থ ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, তাহারা অহঙ্কারী অবিশ্বাসী-দলভুক্ত। ঈশ্বরের রাজ্যে অবিশ্বাস নিশ্চয়ই চূর্ণ হইবে। সত্যের জয়, বিশ্বাসের জয় হইবেই হইবে। তোমরা কি মনে কর যে বাগ্-দেবতা তোমাদের মনোনীত হইলেন না বলিয়া তোমরা তাঁহার রসনা ছেদন করিয়া অঙ্গহীন দেবতার পূজা জগতে স্থাপন করিবে? এরূপ আশাকে মনে তিলার্দ্ধ স্থান দিও না। সত্য দেবতা তোমাদের দর্প চূর্ণ করিয়া আপনার নিশান নিখাত করিবেন। যদি অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা পরিহার করিয়া সত্যধর্ম্ম সাধন করিতে চাও তবে ঈশ্বরকে বাক্যস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ কর। যথার্থ ঈশ্বর বাগ্‌দেবতা। হিন্দুস্থানে ঈশ্বরের যে ভাব সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ, ব্রাহ্মগণ, তোমরা সে

ভাব অবহেলা করিতে পার না। তোমরা কে? জগজ্জননী জ্ঞানদেবী সরস্বতীর সন্তান। তোমরা তাঁহারই উপাসক। তিনি চিন্ময়ী চৈতন্যরূপিণী বাগ্‌দেবী। তিনি বাক্যস্বরূপা। কেমন বাক্য? নিত্য-বাক্য, অশেষ অবিনশ্বর বাক্য, সত্য বাক্য, অভ্রান্ত বেদবাক্য। বাক্যই তিনি। বাক্য কি? সেতুস্বরূপ। এক দিকে ঈশ্বর, অন্যদিকে পৃথিবী, মধ্যে ঈশ্বরবাণী সেতুস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সেতু বন্ধ হউক, ঈশ্বর আর মনুষ্যের যোগ থাকিবে না। ঈশ্বরের বাক্য বন্ধ হইলে পৃথিবীর লোকদিগের সঙ্গে এক প্রকার সম্পর্ক ঘুচিল। ঈশ্বরের বাক্যেতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং সেই বাক্যেতেই ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি। যদি ব্রহ্ম-বাণী না থাকে, তবে পাপী সহস্রবার প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিলেও স্বর্গ হইতে কোন উত্তর পাইবে না। কলিকাতা এবং হাওড়ার মধ্যে যদি সেতু না থাকে, তথাকার লোকদিগের সঙ্গে আমাদের কোন সংস্রব রহিল না এবং আমাদের পক্ষে তাঁহাদের থাকা না থাকা সমান। সেইরূপ যদি ঈশ্বর গুরু হইয়া সদুপদেশ না দেন, কথা না কহেন, দুঃখীর প্রার্থনার উত্তর না দেন, অনন্তকাল মৌনীর ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে

দুঃখী পৃথিবীর পক্ষে ঈশ্বর থাকা না থাকা সমান। যদি ব্রহ্মবাক্যরূপ সেতুর যোগ না থাকে, তবে ঈশ্বরের সদ্‌গুরু ও পরিত্রাতা হওয়া অসম্ভব। কেন না তিনি উপদেশের কথা না বলিলে কিরূপে শিক্ষা দিবেন, কিরূপে শাসন সংশোধন করিবেন? বাক্য ঈশ্বরের বাহন, বাক্য আরোহণ করিয়া ঈশ্বর এই দুঃখী জগতে অবতীর্ণ হয়েন। বাক্যই ব্রহ্মপক্ষীর পক্ষ। ইহার সাহায্যে স্বর্গ হইতে ব্রহ্মপক্ষী নামিয়া আসেন। বাক্য-পক্ষ কাটিয়া দেও, ঈশ্বরের অবতরণ অসম্ভব। এত-কাল হিন্দুস্থানে সরস্বতীর যে আদর হইয়াছে, ইহার কি কোন অর্থ নাই? সরস্বতী মূর্ত্তির অর্থ কি? সরস্বতী বিদ্যার প্রতিমূর্ত্তি। তিনি স্বয়ং বিদ্যাস্বরূপা। ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানের আকর। বিমল জ্ঞানজ্যোতিঃ অতিশয় শুভ্র; উহার অভাবই অজ্ঞান অন্ধকার। জ্ঞান আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল, অজ্ঞান অন্ধকারের ন্যায় কাল। যাহারা আদিতে ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারা জ্ঞানজ্যোতিঃ বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন ও ধ্যান ধারণ করিতেন। এই জন্যই কাল-ক্রমে পৌত্তলিকেরা সরস্বতীর মূর্ত্তি নির্ম্মল শুভ্রবর্ণে চিত্রিত করিল। জ্ঞান শুভ্র জ্যোতিস্বরূপ। ঐ

জ্ঞানকে ঘন কর, আরও ঘন কর, ক্রমে খুব ঘনীভূত কর। অবশেষে একটী সাদামূর্ত্তি কল্পনাতে নিষ্পন্ন হইল। হিন্দুস্থান উহাকে সরস্বতী নাম দিল এবং ঐ ঘন শুভ্র প্রতিমাকে প্রণাম করিল। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যোগবলে জড় প্রতিমাকে উড়াইয়া দিলাম ; কিন্তু উহার মধ্যে নিরাকারা বিদ্যাকে দেখিয়া বলিলাম —"হে নিরাকারা বাগ্‌দেবী সরস্বতী, তোমাকে প্রণাম করি"। প্রকৃত সরস্বতী বাহিরের ক্ষুদ্র প্রতিমা নহে, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব শুভ্র জ্ঞানজ্যোতিঃ যাহা অনন্ত আকাশে বিস্তৃত রহিয়াছে। অনন্ত আকাশব্যাপিনী সরস্বতী। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে, যোগচক্ষে যে দিকে তাকাও সেই দিকে এই ত্রিভুবনব্যাপিনী ত্রিভুবনেশ্বরীকে দেখিতে পাইবে। এই অনন্ত সরস্বতী বাগ্‌দেবী সকলেরই পূজনীয়া ও স্তবনীয়া দেবতা। ইহার অর্চ্চনা না করিলে জীবের মূঢ়তা এবং অবিদ্যার অন্ধকার বিদূরিত হয় না। ইহার শরণাপন্ন হইয়া জীব অজ্ঞান তিমির হইতে মুক্তি লাভ করে। ইনিই জ্ঞান দান করেন, ইনিই সদুপদেশ দিয়া ভ্রম ও অসত্য বিনাশ করেন। ইনি যেমন বিদ্যাদায়িনী জ্ঞানদেবী, তেমনই সুমধুর বীণাবাদিনী সঙ্গীতের দেবী। সদ্‌গুরু হইয়া

ইনি সত্য শিক্ষা দেন, ইঁহার স্বরও অতি সুমিষ্ট। ইঁহার প্রত্যেক কথা সার সত্যগর্ভ এবং মধুর ও কোমল, সুললিত সঙ্গীত অপেক্ষাও সুমধুর, ইঁহার কণ্ঠ অতি কোমল। যেমন ইঁহার নির্ম্মল বিমল জ্ঞানের প্রভা দেখিলে মন আলোকিত হয়, তেমনি ইঁহার কোমল কণ্ঠের সুস্বর শুনিলে প্রাণ বিমোহিত হয়। ইনি জ্ঞানের ঈশ্বর, সুরেরও ঈশ্বর। ইনি সর্ব্বদা জ্ঞানের কথা বলেন এবং ইঁহার প্রত্যেক কথা অমৃতের ন্যায়। ইনি বাগ্‌দেবী সুরেশ্বরী। ইনি অনন্ত ব্রহ্মের একটি স্বরূপ। ইনি জগজ্জননী প্রকৃতির এক অংশ। কেহ কেহ ভ্রমাচ্ছন্ন হইয়া সরস্বতীকে সাকার মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আমরা কি মূল সরস্বতী ব্রহ্মপ্রকৃতিকে অস্বীকার করিব? শাখার দোষ বলিয়া মূল পরিত্যাগ করিব কেন? নদী বিষাক্ত হইয়াছে বলিয়া, যে হিমালয় হইতে নদী বিনিঃসৃত হইতেছে, আমরা সেই হিমালয়কে অগ্রাহ্য করিতে পারি না। যখন এদেশে মূর্ত্তিসরস্বতী কল্পিত হয় নাই, তখনও অনন্ত ব্রহ্মের মধ্যে নিরাকারা সরস্বতী বাস করিতেছিলেন। বাগ্বাদিনী সরস্বতী সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন। ব্রহ্মের হৃদয়বাসিনী বাগ্‌দেবী সরস্বতীর মুখ হইতে সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্টির

আজ্ঞা বাহির হইল, তৎক্ষণাৎ উহা হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইল। তখন অবধি আজ পর্য্যন্ত তিনি অনন্তকাল অবিশ্রান্ত বাক্য বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহার বাক্যের বিরাম নাই। কি দিবসে, কি রজনীতে, তিনি অনবরত বাক্য বলিতেছেন। সরস্বতীর জিহ্বার বিশ্রাম নাই এবং তাঁহার বীণাও অবিশ্রান্ত বাজিতেছে। বীণাপাণীর সাধকগণ, যখনই তোমরা কাণ পাতিবে তখনই তোমরা সরস্বতীর বাক্য এবং সঙ্গীত শুনিতে পাইবে। যদি জ্ঞান চাও, যদি নূতন নূতন সত্য শিখিতে চাও, সরস্বতীর বাক্য শ্রবণ কর। যদি প্রাণের মধ্যে গভীর আরাম চাও তবে তাঁহার শান্তিপ্রদ সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ কর। সরস্বতীর জিহ্বা হইতে যে সকল বাক্য নিঃসৃত হইতেছে, তাহা জ্ঞান এবং শান্তি উভয়ই দান করে। হে ব্রাহ্ম, তুমি কদাপি মনে করিও না যে, তোমার ব্রহ্মের জিহ্বা নাই। তাঁহার এক অনন্ত আকাশব্যাপিনী জিহ্বা আছে। সেই জিহ্বা দ্বারা ঈশ্বর অনন্ত আকাশে অনন্তকাল অসংখ্য ভাষায় অসংখ্য কথা বলিতেছেন এবং জীবের হিতের নিমিত্ত যোগভক্তি প্রভৃতি বিচিত্র তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। ব্রাহ্ম, যখন তুমি স্বীকার কর যে, তোমার ঈশ্বরের শুনিবার শক্তি

অর্থাৎ কাণ আছে, তুমি কিরূপে বলিবে যে তঁহার কথা বলিবার শক্তি অর্থাৎ মুখ নাই? যিনি তোমার শত শত প্রার্থনা শুনিতে পারেন, তাঁহার কি প্রার্থনার উত্তর দিবার ক্ষমতা নাই? কি ভয়ানক অসঙ্গত কথা! যাঁহার কাণ আছে নিশ্চয়ই তাঁহার জিহ্বাও আছে। কেহ কেহ বলেন ইহাতে সাকার দোষ পড়ে। কখনই না। যদি ব্রহ্ম কাণ বিনা শ্রবণ করেন, তিনি কি জিহ্বা বিনা, মুখ বিনা কথা কহিতে পারেন না? যদি তুমি বিশ্বাস কর যে, তোমার ঈশ্বর শ্রবণ-হীন হইয়াও তোমার সুদীর্ঘ প্রার্থনা সকল শ্রবণ করেন, তবে ইহা কেন বিশ্বাস কর না যে জিহ্বা বিহীন হইয়াও তিনি তোমার প্রার্থনার উত্তর দিতে পারেন? শুনিতে পারেন বলিয়া তিনি সাকার হইলেন না, তবে বলিতে পারেন বলিয়া কেন সাকার হইবেন? যদি ঈশ্বরের উত্তর দিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে তাঁহার প্রার্থনাদি শুনিবার প্রয়োজন কি? শুনিবার যন্ত্র শ্রবণেন্দ্রিয় নাই, অথচ ঈশ্বর আমাদের সকল কথা শুনিতেছেন, সেইরূপ তাঁহার বাক্য বলিবার যন্ত্র নাই, অথচ অনবরত বাক্য বলিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে

আরম্ভ হইয়াছে, কবে শেষ হইবে কেহ জানে না। ব্রহ্মবাণীর শেষ নাই। মানুষ অৰ্দ্ধঘণ্টা কি পাঁচ ঘণ্টা বক্তৃতা করে এবং তাহার পর অবসন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু ঈশ্বর অনন্তকাল অবিশ্রান্ত বক্তৃতা করিতেছেন এবং কত কোটী ভাষায় কোটীভাবে বক্তৃতা করেন তাহার সংখ্যা নাই। তিনি প্রত্যেক জাতির সঙ্গে সেই জাতীয় ভাষার কথা কহিতেছেন। তিনি জ্ঞানী মূর্খ, ধনী, দীন, পাপী, সাধু সকলের সঙ্গে প্রতিজনের উপযোগী বিভিন্ন ভাষায় কথা কহিতেছেন। তিনি সকল ভাষা জানেন। তাঁহার অজানিত কোন বিদ্যা কিম্বা কোন ভাষা নাই। আমাদের ব্রহ্মের মুখ হইতে অসংখ্য বেদ বেদান্ত অসংখ্য পুরাণ কোরাণ নিয়ত বাহির হইতেছে। আমাদের ঈশ্বরের ধৰ্ম্মশাস্ত্র কত কে জানে! খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের এক বাইবেল, মুসলমান-দিগের এক কোরাণ। কিন্তু আমাদিগের ধৰ্ম্মশাস্ত্র কত তাহার সংখ্যা নাই। কেন না আমাদের ঈশ্বর অবিরত কথা কহিতেছেন, তাঁহার কথার বিরাম নাই সুতরাং আমাদের বেদ বেদান্তেরও অন্ত নাই। প্রতি-বর্ষে, প্রতি মাসে, প্রতি পক্ষে, প্রতি দিনে, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মিনিটে সেই সদ্গুরু উপদেশ, আদেশ ও

প্রত্যাদেশ বিধান করিতেছেন এবং প্রত্যেক জীবের জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করিতেছেন। তিনি অহর্নিশি তোমাকে তোমার মত, আমাকে আমার উপযোগী, অপর এক জনকে তাহার প্রয়োজনীয় কথা বলিতেছেন। মনে করিয়া দেখ, কত কোটী কথা ও কত প্রকার কথা তাঁহার বলিতে হয়। ঠিক মানুষ যেমন বক্তৃতা করে, তেমনি আমাদিগের জননী বাগ্‌দেবী সরস্বতী অনন্ত আকাশরূপ বেদীর উপরে বসিয়া সুমিষ্ট ভাষায় কত উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার ন্যায় এমন সুবক্তা, এমন উৎকৃষ্ট আচার্য্য, এমন সদ্‌গুরু আর কেহই নাই। তাঁহার বেদীর চারিদিকে বসিয়া কোটী কোটী শিষ্য তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেছে। ইহা কল্পনা নহে, ইহা কবিত্বের কথা নহে; কিন্তু সত্য সত্যই অগণ্য যোগী ঋষি, অগণ্য সাধু ভক্ত, অগণ্য বৈরাগী সন্ন্যাসী, সেই অনন্ত আচার্য্যের সুমধুর উপদেশ শুনিতেছেন। অনন্ত আকাশসিংহাসনে বসিয়া এক প্রকাণ্ড প্রবক্তা, এক বৃহৎ গুরু বক্তৃতা করিয়া বলিতেছেন;—চোর, চুরি করিস্ না, স্বেচ্ছাচারী, স্বেচ্ছাচার করিস্ না, সংসারী, সংসারে ডুবিস্ না. অবিশ্বাসী, অবিশ্বাস করিস্ না।

ব্রাহ্ম, যোগ সাধন কর; প্রেমিক, একেবারে ভক্তি-রসে প্রাণকে নিমগ্ন কর। এইরূপে ব্রহ্ম নানা ভাষাতে নানা প্রকার বিধিনিষেধপূর্ণ উপদেশ দিতেছেন। ব্রহ্মের উপদেশ কখনও থামে না, তাঁহার বক্তৃতা অবিরাম হইতেছে; কেবল বিবেককর্ণ পাতিলেই শুনা যায়। কি মধ্যাহ্নকালে কি নিশীথে, যখন ইচ্ছা কর তখনই তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে পাইবে। তুমি অবসন্ন হইতে পার; আর শুনিতে পার না বলিয়া কাণ বন্ধ করিতে পার; কিন্তু ব্রহ্মের বাক্যসমীরণ ক্রমাগত চলিতেছে। শ্রোতাদিগের ক্লান্তি হয়; কিন্তু বক্তার শ্রান্তি হয় না। শ্রোতা থাকুক আর না থাকুক, বাক্যস্বরূপ ব্রহ্ম, বাগ্‌দেবী সরস্বতী অবিশ্রান্ত বক্তৃতা করিতেছেন। কেন না বক্তৃতা করাই তাঁহার স্বভাব। বাক্যস্বরূপ কিরূপে বাক্যবিহীন হইয়া থাকিবেন? এমন নিত্য বাগীশ্বরী মধুরভাষিণী সরস্বতী আর কি কোথাও দেখিয়াছ? ব্রহ্মমুখ হইতে জীবন্ত জ্ঞান-স্রোত বিনিস্থত হইয়া জীবের অজ্ঞান জঞ্জাল দূর করিতেছে। সরস্বতীর নির্ম্মল মুখ হইতে সত্যজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া সাধকদিগের মনের অন্ধকার বিনাশ করিতেছে। কি তেজস্বী বক্তা! অনেক মানুষের

বক্তৃতা শুনিলাম, কিন্তু ব্রহ্মের বক্তৃতার ন্যায় এমন জীবন্ত জ্বলন্ত বক্তৃতা আর কোথাও শুনি নাই। জ্ঞানস্বরূপা সরস্বতী ক্রমাগত বিচিত্র জ্ঞানতত্ত্ব প্রসব করিতেছেন। মনুষ্যমনে যত সত্য, যত ভাবের বিমল কিরণ প্রকাশিত হয়, তৎসমুদয়ে সরস্বতীর জ্যোতিঃ। ব্রহ্ম ছাড়া সকলই অজ্ঞান এবং অবিদ্যা, সরস্বতী ছাড়া সকলই দুষ্টবুদ্ধি এবং দুর্ম্মতি। স্বয়ং ব্রহ্ম অনন্ত সরস্বতী হইয়া মনুষ্যের মনে দিব্য জ্ঞানালোক জ্বালিয়া দেন এবং মধুর সঙ্গীতচ্ছলে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন। জীবকে মোহজাল এবং অবিদ্যার অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর জ্ঞানরূপে, বিদ্যারূপে, বাগেদবী সরস্বতীরূপে তাহার অন্তরে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দান করেন। তিনি স্বয়ং সত্যরূপে সুবুদ্ধি ও সুমতিরূপে মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হন। সত্য কেবল দেবদত্ত নহে, সত্যই দেবস্বরূপ এবং আরাধ্য বস্তু। তোমাদের মনের সুনীতি বা সুমতি কে তাহা জান? তাহারাই স্বয়ং সরস্বতী এবং তোমাদের বরণীয়া। যত কিছু শুভজ্ঞান ও শুভ ভাব তোমাদের অন্তরে আসিতেছে, সে সমুদয় বাগেদবীর মুখের কথা। জলস্রোতের ন্যায় দিনরাত্রি উহা

মনুষ্যমনে কল কল রবে ধাবিত হইতেছে, উহার শেষ নাই। ব্রহ্ম-কথকের কথা আর শেষ হয় না। দশ বৎসর, পঞ্চাশ বৎসর, যত বৎসর ইচ্ছা কর তাঁহার কথকতা অন্তরে শুনিতে পার। তাঁহার মুখে নিত্য ভাগবৎ, নিত্য মহাভারত শুন, তিনি আহ্লাদের সহিত শুনাইবেন। তিনি নূতন নূতন ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, নূতন বেদ বেদান্ত এবং নূতন পুরাণ তন্ত্রাদি শুনাইবেন। ইংরাজী সংস্কৃত যে কোন ভাষায় উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা কর, সেই ভাষায় তিনি উপদেশ দিবেন। পর্ব্বত-শিখরে, নদীতটে, গৃহে, কাননে, যেখানে ইচ্ছা সেই খানে শিক্ষা দিবেন। প্রেমতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব যাহা চাও তাহাই তিনি শিক্ষা দিবেন। তাঁহার মুখে যে উপদেশ শুনিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রান্তির আশঙ্কা করিবে না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বোত্তম জ্ঞান, অভ্রান্ত পরাবিদ্যা তাঁহারই নিকটে পাইবে। সে জ্ঞান কঠোর নহে, অতিশয় সুমিষ্ট। বাগীশ্বরী একটীও কর্ক্কশ কথা বলেন না, বলিতে পারেন না। কোমল নারীকণ্ঠ হইতে কর্ক্কশ রূঢ় কথা কিরূপে বাহির হইবে? চিত্তহারী চৈতন্যস্বরূপ হরির কথা পাঁচ মিনিট শ্রবণ করিলে প্রাণ মন বিমোহিত হয়। যখন হরির কথা

শুনি, তখন মনে হয় ঠিক যেন হরি সপ্তস্বরসংযোগ করিয়া বীণা বাজাইতেছেন। হরির গলা এমনি মিষ্ট। যিনি ভাল তাঁহার সকলি মিষ্ট, কথাগুলি পর্য্যন্ত যেন মধুমাখা। যখন বিবেক এবং ভক্তিকর্ণে ব্রহ্মবাণী শুনি তখন বলি, "হে ঈশ্বর, তুমি কি গান করিতেছ না বক্তৃতা করিতেছ?" বাস্তবিক স্বরেশ্বরীব সকল কথা সঙ্গীতের ন্যায় সুস্বর ও সুমধুর। তাঁহার সমুদয় বেদ সামবেদ, সুললিত ছন্দে বিরচিত এবং সুমিষ্ট সুর তান, সুকোমল রাগরাগিণীতে সংযুক্ত। হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা এই বাগ্দেবীর পূজা অর্চ্চনা কব এবং ইহার কথামৃত পান কবিয়া প্রাণকে শীতল কর। ব্রহ্মের তেত্রিশ কোটী রূপের মধ্যে এই এক সরস্বতী রূপ অর্থাৎ বিদ্যারূপ তোমরা আদর ও যত্নের সহিত সাধন কর। তোমরা তোমাদিগের প্রাণমন্দিরে জ্ঞানাসনে বসাইয়া এই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের, এই অনন্ত চিন্ময়ী সরস্বতীর পূজা কর। নিয়ত তাঁহাব কথা শ্রবণ করিয়া জ্ঞান ও সুবুদ্ধি সঞ্চয় কর।

নৃত্যকালী।

বন্ধুগণ, তোমরা জান তালে তালে নাচাই যথার্থ নৃত্য। তালের উৎপত্তি কোথা হইতে, তোমরা কি জান? তাল, তাণ্ডব এবং লাস এই দুই শব্দের আদি বর্ণ যোগে নিষ্পন্ন। তাণ্ডব মহাদেবের এবং লাস মহাদেবীর নর্ত্তন। প্রকৃতি পুরুষের তাল লয় যুক্ত সম্মিলিত নৃত্যে যে ভাব হয়, তাহারই নাম তাল। আজ সেই মহানৃত্যের তত্ত্ব কিছু বলি শ্রবণ কর।

নৃত্য স্বাভাবিক। ইহা শিক্ষা এবং সাধনের ফল নহে। মনের আনন্দ উথলিয়া উঠিলেই মানুষ নৃত্য করে। এ বিষয়ে স্বভাবই গুরু। অনেকে নৃত্যের গূঢ় তত্ত্ব না জানিয়া মনে করে বুঝি মনুষ্য বিকৃত হইলেই নাচে। কিন্তু যদি নৃত্য সত্য সত্যই ঈশ্বরের অনভিপ্রেত হয় তবে ভক্তেরা নাচেন কেন? বিষ্ণুভক্তেরা নাচেন কেন? সাধুগণ কেহ প্রকাশ্যে কেহ গোপনে নাচেন কেন? যেখানে ধর্ম্মের শাসন, যেখানে শরীর মন বিশুদ্ধ, যেখানে মদ খাওয়া নাই, কোন প্রকার দুর্নীতি নাই, যেখানে হরি নাম মুহুর্মুহু কীর্ত্তিত হয় সেখানে কেন নৃত্য? মহাযোগী মহাদেব কেন নাচিলেন? যোগের

মধ্যে নৃত্য কিরূপে এবং কেন প্রবৃষ্ট হইল? ভক্ত নাচেন, যোগী নাচেন, সকল শ্রেণীর সাধুই নৃত্য করেন। ("হরি ব'লে দেবগণে নাচে"); এখন জিজ্ঞাস্য এই,— ভ্রাতৃগণ, তোমরা কি নৃত্যকে পাপ মনে করিয়া ঘৃণা করিবে? যদি যোগী ঋষি এবং সাধু মহাত্মাদিগের সংস্পর্শে নৃত্য পবিত্র হইল তবে কিরূপে বিশ্বাস করিব যে মনুষ্যের সম্বন্ধে নৃত্য মহা পাপ! মনুষ্যসমাজ ছাড়িয়া, জড় প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করি, সেখানেও পবিত্র নৃত্য দেখিতে পাই। আকাশের চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদিকে জিজ্ঞাসা করি, তাহারা নৃত্য করে কি না, তাহারা সকলে সমস্বরে বলে;—"এই দেখ আমরা কেমন সুন্দররূপে আমাদের প্রাণেশ্বর ভুবনেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশপথে নিত্য নৃত্য করিতেছি।" যোগচক্ষে জ্ঞান নেত্রে স্পষ্টরূপে দেখা যায় যাহারা মনুষ্য নহে, স্বাধীন নহে, যাহাদের কোন অবস্থাতে পাপ করিবার সম্ভাবনা নাই, সেই সকল জড় পদার্থও নৃত্য করিতেছে। নৃত্য করিলে ঘুরিতে হয়। দেখ আকাশের জ্যোতিশ্চক্র সকল নৃত্য করে, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পথে ঘোরে। পৃথিবী ঘোরে, চন্দ্র ঘোরে, গ্রহ তারা ঘোরে। যাহারা নৃত্য করে তাহারা তালে তালে নৃত্য করে।

নভো মণ্ডলে তারা নক্ষত্রাদিও দেখ তালে তালে ঘুরিতেছে ও নৃত্য করিতেছে। তালে তালে নৃত্য করা কি ? ঠিক সময়ে পদ নিক্ষেপ। চন্দ্র তারকা সকলও ঠিক সময়ে পা ফেলিয়া ঘুরিতেছে। কৌতুকপ্রিয় লীলারসময় হরির কি সুন্দর লীলা! বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তিনি কত আশ্চর্য্য খেলা খেলিতেছেন ! দেখ আকাশ-রঙ্গ-ভূমিতে তিনি যতগুলি গ্রহ উপগ্রহ ছাড়িয়া দিয়াছেন তাহারা কেমন তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতেছে। তাহাদিগের গতি নিয়মিত। আকাশে মনোহারিণী নারীরূপে চন্দ্রমা নাচিতেছে ; আপনার সৌন্দর্য্য, আপনার ভুবনমোহিনী জ্যোৎস্না দেখাইতে দেখাইতে ঐ নর্ত্তকী দুই ঘণ্টার মধ্যে কতদূর চলিয়া গেল। বেতাল হইবে না, একবারও পদস্খলন হইবে না, চন্দ্রমা আপনার সখীদিগের সঙ্গে চিরকাল তালে তালে নাচিয়া বেড়াইতেছে। কেন উহারা নাচিতেছে ? কে তাহাদিগকে নাচিতে শিখাইল ! আনন্দময়ীর রাজ্যে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে আনন্দে নৃত্য হইতেছে। সকলের মধ্যে দেবদেব মহাদেব এবং মহাদেবী প্রকৃতি বা নৃত্যকালী নাচিতেছেন, তাঁহার চারিদিকে আর সকলে নাচিতেছে। কে কতক্ষণ ও কি ভাবে নাচিবে সমস্ত ঠিক আছে। আকাশনাট্যভূমিতে ইহারা

কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে ও হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে। সহাস্য শশী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে, এই আমাদের চক্ষের সমক্ষে নাচিতেছিল, আবার কিয়ৎকাল পরে আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া কোথায় নাচিতে গেল, আবার পর রজনীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখা দিল। আমরা যে পৃথিবীতে আছি এ পৃথিবীও নাচিতেছে, কিন্তু আমরা ইহাতে বাস করিতেছি বলিয়া ইহার নৃত্য দেখিতে পাই না। বিশাল বিশ্বগণ আকাশে নাচিতেছে। আহা! কি চমৎকার নিয়মে তালে তালে এ সকল ভ্রাম্যমাণ জগৎ গগনপ্রাঙ্গণে নাচিতেছে! আবার যখন নিকটে আসিয়া দেখি তখন নিজের শরীরের মধ্যে সুন্দর নৃত্য দেখিতে পাই। কেমন সুন্দর তালে তালে আমার শরীরের মধ্যে রক্ত নাচিতেছে! শরীর তোমার ভিতরে দিন রাত্রি কেমন আশ্চর্য্য নৃত্য হইতেছে! যে সময়ে রক্ত সৃজন হইল সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তুড়ুক তুড়ুক করিয়া রক্ত শরীরের ভিতর দিয়া নাচিতে নাচিতে চলিল। রক্ত যে কেবল নাচিতেছে তাহা নহে, আবার উহা ঠিক তালে তালে নাচিতেছে। যদি শরীরের একটু জরবিকার হয় অমনি রক্তের তাল ভঙ্গ হয়। চিকিৎসকেরা ঘড়ী ধরিয়া রক্তের তাল শ্রবণ করেন এবং ইহার বেতাল

সঞ্চালন দেখিলেই রোগ সিদ্ধান্ত করেন। প্রকৃতিস্থ থাকিলে নিশ্চয়ই দেহ মধ্যে রক্ত ঠিক মিনিটে মিনিটে চলে, কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হয় না। যোগীর রক্ত, ভক্তের রক্ত, সেবকের রক্ত নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মপদ প্রদক্ষিণ করিতেছে। হে রক্ত, তুমি হরিভক্ত, তুমি হরিনাম গান করিতে করিতে নৃত্য কর, তোমাকে নমস্কার করি। হে রক্ত, তুমি ব্রহ্মের প্রেমানুরঞ্জিত শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া লাল হইয়াছ। হে রক্ত, তুমিই আমার প্রাণ, বল উদ্যম, সুস্থতা, সৌন্দর্য্য সকলি। যতক্ষণ তুমি আমার শরীরের মধ্যে নাচিতে থাক ততক্ষণই আমার জীবন। তুমিই আমার শক্তি, তুমিই আমার আশা ভরসা, তোমার নৃত্য বন্ধ হইলেই আমার মৃত্যু। যে দিন তোমার নাচ বেতাল হয়, সেই দিন ভয়ানক রোগ আসিয়া আমাকে আক্রমণ করে। যতদিন তুমি আনন্দে নৃত্য কর, ততদিন আমি সুখ স্বচ্ছন্দতা আনন্দ সুস্থতা সম্ভোগ করি। রক্ত কি চমৎকার তোমার নৃত্য! তোমার নৃত্য ভক্তির নৃত্য। যখন তোমার ভিতরে ব্রহ্মোন্মত্ততা প্রবেশ করে, তখন তোমার নৃত্য প্রগল্ভা ভক্তির নৃত্য ও মহোল্লাসের নৃত্য হয়। তুমি ব্রহ্মের হস্তে উৎপন্ন, ব্রহ্ম চরণে প্রণত। হে ভক্ত, তুমি যদি প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচিতে চাও তবে

রক্তের নৃত্যের সঙ্গে তালে তালে নৃত্য কর। রক্তের নৃত্য মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। বিধাতা যেরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন রক্ত ঠিক সেই নিয়ম অনুসারে নৃত্য করে। তাঁহারই ইঙ্গিতে, তাঁহারই নিয়মে রক্ত নাচিতেছে। কেহ দেখে না, কেহ তাহার প্রতি মনোযোগ করে না, তথাপি উহা অহর্নিশি আপনার আনন্দে নাচিতেছে। রক্তের নাচ গান কেবল হরিই গোপনে বসিয়া দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন। নৃত্য আনন্দের একটি প্রধান লক্ষণ। যখনই কোন বাদ্য-যন্ত্রে নৃত্যের বাজনা বাজে, তখনই শরীরের অস্থি মাংস সমুদায় নাচিয়া উঠে। সেই বাদ্যে তোমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিবে, শরীরের সঙ্গে উহার এমনি নিগূঢ় যোগ। বেহালা হউক, পিয়ানো হউক, বীণা হউক, মৃদঙ্গ হউক, যে কোন সুমধুর যন্ত্র হউক উহার শব্দ শুনিলেই মন নাচিয়া উঠে। একজন যন্ত্র বাজাইতেছে, তাহার বাদ্য শুনিয়া শত শত লোকের শরীর মন নাচিয়া উঠিল। বাদ্য যন্ত্র যেন সাঙ্কেতিক ভাষায় বলে;—"এস, কে নাচিবে এস।" "আয না ভাই নাচি।" পথিমধ্যে কোন দুঃখী বৈষ্ণব মধুর মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, আমি উপরের ঘরে বসিয়া বাদ্য শুনিলাম, তৎক্ষণাৎ মন নাচিয়া উঠিল।

আমি মনে করিলাম, আমি বড় মানুষের সন্তান, বৈষ্ণবের বাজনা শুনিয়া আমি নাচিব ? যেখানে যন্ত্র বাজিতেছিল সে স্থানে আমি গেলাম না ; কিন্তু যতক্ষণ আমি উপরে বসিয়া রহিলাম ততক্ষণ আমার প্রাণ নাচিতে লাগিল। আমি অপবাদ ভয়ে, সম্মান লাঘবের ভয়ে সে মৃদঙ্গের দিকেও গেলাম না, কিন্তু মন, তুমি লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিয়া অসভ্যের ন্যায় নাচিলে ? বাহিরে আমি নৃত্য সম্বরণ করিলাম কিন্তু ভিতরে নির্লজ্জ হইয়া তুমি নাচিলে। যে না নৃত্য করে সে দুঃখীদিগের মধ্যে দুঃখী ও হীন। যে হাতে চাঁদের সৃষ্টি, যিনি চাঁদকে নাচান, তুমি তাঁহার হাতে নাচিবে না ? ঈশ্বর নিজে নাচেন, তাঁহার সমুদয় সৃষ্টি নাচে, আর অধম মনুষ্য তুমি নাচকে নীচ মনে করিবে ? ঈশ্বরের নাম নৃত্যকালী নৃত্যগোপাল। যখন হৃদয়ের ভিতরে স্বর্গের কোন মধুর যন্ত্রধ্বনি শুনিতে পাই, তখন মন আপনাকে আপনি বলে, "আয়রে ভাই ঐ স্বর্গীয় বাদ্যের সঙ্গে তালে তালে নাচি।" কোন্ গুপ্ত নারদ বীণা বাজাইয়া আমার মন ভুলাইল ? কে আমাকে নাচিতে ডাকিল ? সৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া এক গুপ্ত বাদ্যকর মধুর বীণা বাজাইতেছেন, সেই বাদ্যের সঙ্গে তালে তালে সমস্ত সৃষ্টি নাচিতেছে। অতএব হে ভক্ত,

যদি তুমি তোমার প্রাণেশ্বরের সঙ্গে এক আত্মা, এক প্রাণ হইয়া থাকিতে চাও তবে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া তালে তালে নৃত্য কর। চাঁদের সঙ্গে, বৃষ্টির ধারার সঙ্গে, সমুদ্রের লহরির সঙ্গে, বায়ুর হিল্লোলের সঙ্গে, রক্তের গতির সঙ্গে তালে তালে নৃত্য কর। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে ভক্ত নৃত্য করেন তাঁহাকে আর দুঃখ বিকার অভিভূত করিতে পারে না। ঈশা, মুসা, শাক্য, নারদ চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই নৃত্য করিতেছেন, ভগবান আপনার আনন্দে আপনি নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার নৃত্য দেখিয়া তাহার ভক্তদিগের হৃদয়েও আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে, যাঁহার পা নাই তিনি নাচিবেন কিরূপে? যাঁহার পা নাই যিনি অনন্ত নিরাকার আনন্দ স্বরূপ, তিনিই কি নাচিতে পারেন? পা কি নাচে? মনই নাচে, শরীর কখনই নাচে না। যথার্থ নৃত্য অন্তরে, বাহিরে উহার প্রকাশ মাত্র। কেবল পদসঞ্চালন করিলেই কি নৃত্য হয়? হৃদয়ের উল্লাসই প্রকৃত নৃত্য। বাস্তবিক ঘনীভূত আনন্দই নৃত্য। ইহা নিরাকার। বাহিরের চক্ষে উহা দেখা যায় না। যিনি চিদানন্দ, যিনি সুখ স্বরূপ তিনি অনন্ত নৃত্য। তাঁহার নাচই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আদর্শ নৃত্য। তিনি আপনাতে আপনি

নাচেন। নিত্যানন্দই নৃত্য গোপাল। যখনই হৃদয়ে যোগানন্দরস উথলিয়া উঠে, তখনই প্রাণের মধ্যে ঘোরতর নৃত্য আরম্ভ হয়। সে অনিবার্য্য দুর্জ্জয় নৃত্য কি কেহ সম্বরণ করিতে পারে? যখন মন নাচে, তখন শির, স্নায়ু অস্থি মাংস সমুদয় নাচে, মাথার প্রত্যেক চুল নাচে, ভক্তের মনের সঙ্গে তাঁহার শরীর মন এবং সমস্ত প্রকৃতি তালে তালে নাচিতেছে। সমস্ত প্রকৃতির এক স্বর, এক তাল এবং সকলে এক তালে পা ফেলিতেছে। বাস্তবিক সৃষ্টি এক প্রকাণ্ড অবিশ্রাম নৃত্যের ব্যাপার। এই অনন্ত নৃত্যের সঙ্গে আমারা যোগ দিতে চাই। যে দিন আমরা এই নৃত্যে যোগ দিতে পারিব সে দিন আমরা পুণ্য ও আনন্দের নবজীবন লাভ করিব।

এই নবজীবন লাভ করিবার উপায় কি? দুর্গা এবং কালী পূজা করিলেই কি নবজীবন লাভহয়? দূর্গাকে দেখিলে সুখ হয়; কিন্তু তাঁহার রূপান্তর দেখিয়া ভয় হয় কেন? আনন্দ এবং ভয় এ দুই বিপরীত ভাব কোথা হইতে আসিল? এ দুই মনেতেই আছে। কেবল মনের ভাবই দেবীকে দুই বর্ণে চিত্রিত করে। যখন ভালবাসার সহিত পূজা কর, অভয়াকে ভক্তি দান কর, তখন নয়ন একবর্ণ দর্শন করিল; কিন্তু যখন ভয়ে ভীত হইয়া দেবীকে

দেখিতে প্রবৃত্ত হও সে সময় সেই নয়নই অনন্ত শক্তির ভিতরে ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দেখিতে পায়। ভাবেই সাদা কাল হয়। দুর্গার সোণার রূপ, ভাবুক কাল মনে করে।

যখন হৃদয় পাপে আচ্ছন্ন হয়, তখন পাপী ঈশ্বরের সুন্দর রূপ দেখিতে পায় না। সেই সময়ে মনে বড় ভয় উপস্থিত হয়। সেই ভয়ের মধ্য হইতে ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি বাহির হইয়া জীবগণকে কম্পিত করে। সেই ভীষণা দেবী অনন্তকালরূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া জীবগণের মস্তক ছেদন করেন। এই কাল অস্ত্রের আঘাতে কত মুণ্ড ছিন্ন হইল, কত বংশ বিলুপ্ত হইল। কালরূপ, অস্ত্র ধারণ করিয়া যিনি ছেদন করেন তিনি কালী। সেই কালী-কেই সকলে মা বলে। কাল যাহাদিগকে মারিল ভক্ত তাহাদিগের ছিন্ন মস্তক লইয়া মুণ্ডমালা করিয়া কালীর গলায় পরাইয়া দিল কি জন্য? জীবকে ভীত করিবার জন্য। শক্তির এরূপ মূর্ত্তির অভিপ্রায় এই জীবকে ভীত করিয়া পরলোকের সম্বল করিয়া দেওয়া। ভীত না হইলে জীবের অৰ্দ্ধ অংশ পাপে ডুবিয়া যায়, কিছুতেই উন্নত হইতে পারে না। তুমি বলিতেছ কৈ কোথাও ভয় নাই। প্রেমের চন্দ্র আকাশে উদিত, ভয়ের কারণ কোথায়? ভয়ের বস্তু কি কিছুই নাই? ঈশ্বর

রাজা ইহা মান ? ঈশ্বর রাজা হইয়া দণ্ড দেন, পাপীর বিচার করেন, শাস্তি বিধান করেন, শাস্তি দিয়া পাপীর পাপ নিবৃত্ত করেন। শক্তির এক মূর্ত্তি অতি মনোহরা আর এক মূর্ত্তি ভয়ঙ্করা।

জীব আপনার পাপ আপনি বুঝিতে পারে না, তাই তাহার পাপ বুঝাইয়া দিবার জন্য ব্রহ্মের শক্তি ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিয়াছে। এ সময় সুখের সময় নহে। যখন সুখের সময় ছিল, পৃথিবী চমৎকার জ্যোৎস্নায় আলোকিত ছিল, তখন লক্ষ্মীর সময় ছিল। সে সময়ের আলোক মলিন হয় না। চারিদিক দেখ আজ ঘোর অন্ধকারের আবাস হইয়াছে। কাল রাত্রি আসিয়া উপস্থিত, এখন আর জ্যোৎস্না নাই। সকলের মন প্রসন্ন ছিল, মুখ প্রফুল্ল ছিল, এখন ভয়ে বিষণ্ন। সকলকে ঘোর অমাবস্যায় ঘেরিয়াছে। লক্ষ্মী যে শক্তি, কালী ও সেই শক্তি, কিন্তু সেই সুন্দর মূর্ত্তি কাল হইয়াছে। এযে ব্রহ্মের রুদ্র মূর্ত্তি! অধর্ম্ম দেখিয়া ধর্ম্মরাজ কালী মূর্ত্তি প্রকাশিত করিলেন। যেখানে ভয় থাকিবে, সেখানে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার দেখা দিবে। সেখানে ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া অপরাধীকে শাস্তি দিবে। জীব মনে করিও না

তোমার ঈশ্বর সর্ব্বদা তোমায় সুখ দিবেন, তোমার হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা চাঁদ বিরাজ করিবে, তুমি একবারও অমাবস্যা দেখিবে না। যিনি বেদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, তাঁহারই ভিতরে দুর্গাও আছেন, কালীও আছেন। যিনি অনন্ত মঙ্গলময় ব্রহ্ম, তাঁহারই মধ্যে সেই রুদ্রমূর্ত্তি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।" এই রুদ্র কাল মূর্ত্তি মহাকালী, অথবা জয়কালী। এই জয় কালীই রণরঙ্গিণী, ইনি অসুর বধ করিয়া অনন্ত জয়োল্লাসে তাঁহার ভক্তকে রক্ষাকালী রূপে রক্ষা করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপাইয়া নৃত্য করেন। ইঁহারই নাম নৃত্য কালী।